বাংলাপিডিএফ

কৃষণ চন্দর

এক লায়লা হাজার মজনু

রনি

মূলমূলমূলম

৩৮/বাংলাবাজার/ঢাকা

প্রথম সংস্করণ ঃ বৈশাখ, ১৩৮৬

মূল্য ঃ ১২·০০ টাকা

প্রকাশনায় ঃ

দেওয়ান আবদুল কাদের ॥ ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ

আবুল হাশেম ॥ সোসাইটি প্রিণ্টার্স ॥ ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

শিল্পী ঃ

প্রাণেশ কুমার মণ্ডল

প্রকাশ-কাল ঃ

মে ঃ ১৯৭৯

'সুন্দরী'কে

গুলিস্তান এলাকায় যার দোর্দণ্ড প্রতাপ

কিছুকথা

'এক আওরাত হাজার দিওয়ানে' কৃষণ চন্দরের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। মূলতঃ একটি যাযাবর মেয়ের প্রেমকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। মেয়েটি প্রেম চেয়েছিলো, ঘর বাঁধতে চেয়েছিলো। সাময়িক-ভাবে প্রেম পেলেও ঘর সে বাঁধতে পারেনি। এর জন্যে প্রথমত বাধ সাধে সমাজ এবং সমাজের উঁচুতলার ও নীচুতলার কিছু মানুষ। মেয়েটি এসবের বিরুদ্ধে একাই লড়ে যায়।

অবশেষে মাটির পৃথিবী, প্রকৃতি, সৃষ্টি এবং সৃষ্টির সৃষ্ট সভ্যতা, ভব্যতা ও সংস্কৃতিকে যখন সে জয় করে নিচ্ছিলো তখনি ভবিতব্য তাকে আজীবনের জন্যে বঞ্চিত করে তার প্রেম থেকে, ঘর বাঁধার স্বপ্ন থেকে। কিন্তু কেন?

পাঠকরা কৃষণ চন্দরের 'এক আওরাত হাজার দিওয়ানে' তথা 'এক লায়লা হাজার মজনু'র ভেতরেই সম্ভবতঃ এর উত্তর খুঁজে পাবেন।

৯৯, আরামবাগ
ঢাকা—২

—আখতার-উন-নবী

মনের মতো কয়েকটি অনুবাদগ্রন্থ

ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং
দু'টি উদাস চোখ
চাঁদ, হে চাঁদ
ফুলে ফুলে খুঁজে ফেরে
ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ
এবং আলো এবং আঁধার
রক্তের মত লাল
প্রেমেশ্বরী
নির্মলা
মাটির প্রেম
এজেন্ট এফ. বি. আই.
বাবু গোপীনাথ
হংকং-এ একরাত
নির্বাচিত আরবী গল্প
লাভ স্টোরি
পাঁচ গুণ্ডা এক নায়িকা
সুন্দর পৃথিবী
দু'ফোঁটা পানি
মাণ্টোর অপ্রকাশিত গল্প
শয়তানের পদত্যাগ
স্বর্গের শেষ ধাপ
এক লায়লা হাজার মজনু
শহীদ
দরোজা খুলে দাও

এক লায়লা হাজার মজনু

ষ্টেশন মাষ্টারের কামরায় একটা ছোটখাট হাঙ্গামা যেন।

কুলি, কল্যাণগামী গাড়ী ধরবার যাত্রী সকল, ইয়ার্ড মাষ্টার, টিকেট চেকার, ষ্টেশনের বাইরে ফল বিক্রেতা মাধু, ইয়ার্ডে টহলরত সান্ত্রী, ঝাড়ুদার, জমাদার সবাই উপস্থিত। আর সবাই লাচির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। আর লাচিও সবার থেকে আলগ-থালগ—ষ্টেশন মাষ্টারের টেবিলের সামনে বড় নির্লজ্জ এবং বেপরোয়াভাবে নিজের দু'টি মাংশল পাছার উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার চেহারার উপর এমন ক্রোধের আগুন জ্বলছিলো, যেন এক্ষুণি সবাইকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু এখন সে বড্ড অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে।

এবং ষ্টেশনের তাবৎ লোকজন যারা তাকে ভালো করে চেনে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে আর পরস্পরকে ইঙ্গিতে কি যেন বুঝাচ্ছে।

ইয়ার্ড সান্ত্রী প্রথম যখন লাচিকে নিয়ে ষ্টেশন মাষ্টারের কামরায় প্রবেশ করে, তখন লাচির একখানা হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলো সে। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টারের সামনে এসেই লাচি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো। তারপর দু'টি হাত পাছার উপর রেখে বড় বে-পরোয়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো।

কোন রকমের হাঙ্গামাই ষ্টেশন মাষ্টার রেসক লালের পছন্দ নয়। তিনি সংসারী মানুষ, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে নিবিরোধ জীবনই কামনা করেন। গুজরাটের লোক। পঁচিশ বছর ধরে রেলওয়ের চাকুরীতে আছেন। তার বড় ছেলের রেলওয়েতে টিকেট চেকার হবার সম্ভাবনা।

আছে। এবং ছোট মেয়ে বিমলা কলেজে পড়ে। ওর জন্য বর খুঁজতে খুঁজতে এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। তার উপর ষ্টেশন চালানোর, তাও সুনিপুণভাবে চালানোর মতো এতো বড় দায়িত্ব তার কাঁধে এবং এখন তিনি গঙ্গাদিন ভাইয়া ঘাসওয়ালের সাথে ষ্টেশন ওয়াগনের ঝামেলাটা মিটমাট করছিলেন,—যেখান থেকে তার শ'পাঁচেক টাকা পাওয়ার আশা আছে। অথচ মাঝখান থেকে এই হাঙ্গামা।

রেসক লাল নিজের লম্বাটে চেহারার চিবুকের আঁচিল চুলকোতে চুলকোতে ভরা যৌবনা লাচিকে দেখলেন। পরে ইয়ার্ড সান্ত্রীকে। তার মাথায় গর্তের মতো টাক পড়ে গেছে। দ্রুত তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন ঃ

'কি হয়েছে?'

ইয়ার্ড সান্ত্রী লাচির গায়ে হাত দিয়ে বললো ঃ

'ও ইয়ার্ড থেকে কয়লা চুরি করেছে।'

লাচি আবারো জোরে ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিয়ে বললো ঃ

'গায়ে হাত দিবি না, দূর থেকে কথা বল।'

ভিড়ের মধ্যে উচ্চহাস্য আর অট্টহাস্যের একটা ঢেউ খেলে যায়। ফলঅলা মাধু খুশীর চোটে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ

'আবে সান্ত্রী, হুল ফুটিয়ে দেবে, মৌমাছির রাণী ও।'

'তুই চুপ কর কাঁচা পাঁপতিয়া।'

লাচি মাধুর দিকে তাকিয়ে বললো।

ফলঅলা মাধু মাঝারী উচ্চতার, শক্ত-সমর্থ শরীরের অধিকারী। কোমরে স্রেফ ময়লা একখানা ধুতি জড়ানো, যেটা দিয়ে বড়জোর হাঁটু অবধি ঢাকা যায়। শরীরের বাকী অংশ সব সময় নগ্নই থাকে। গায়ের রঙ শ্যামলা। সারা শরীরের কোথাও কোন লোমকূপ নেই। ওর লোমকূপহীন নগ্ন শরীরে এমন এক শ্যামলিমা চক চক করছিলো যে, লাচি তাকে কাঁচা পাঁপতিয়া বলে পরিহাস করার সাথে সাথে সেই শ্যামলিমা যেন দপ করে নিভে যায়।

এবং ভিড়ের সবাই আবার জোরে হেসে উঠলো।

ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছিলো।

ওই ষ্টেশন মাষ্টার তাড়াতাড়ি লাচিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'ওই পাঁপতিয়া চুরি করেছিস ?'

'পাঁপতিয়া নয়, কয়লা চুরি করেছি।'

লাচি হঠাৎ হেসে উঠে বললো। পরে ষ্টেশন মাষ্টারের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ভিড়ের প্রতি প্রতিশোধের দৃষ্টি ফেলে বলতে লাগলো ঃ

'দেখো দেখো, এও আরেক বোকা।'

রেসাক লাল হতবিহ্বল হয়ে কয়লার জায়গায় পাঁপতিয়া বলে ফেলেছেন বটে, কিন্তু ভিড়ের সবাইকে হাসতে দেখে তিনি নিজেও নিজের হাসি রোধ করতে পারলেন না।

রাগে জ্বলতে থাকা ইয়ার্ড সাহ্রীও হেসে উঠলো।

রেসাক লাল নিজের মাথায় হাত রেখে দৃষ্টি জোড়া নীচের দিকে নত করতে করতে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বললেন ঃ

'বাদ দাও ইয়ার্ড সাহ্রী, দশ নম্বর ডাউন ট্রেন আসার সময় হলো, এদিকে তুমি নিয়ে এসেছো আরেক ঝগড়া।'

পরে ষ্টেশন মাষ্টার ভয়ে ভয়ে লাচির চেহারার দিকে আর এক-বার তাকালেন এবং বললেন ঃ

'যাও—আর কোনদিন ইয়ার্ডে এসো না কয়লা চুরি করতে। যদি এলে কিন্তু জেলে পুরে দেবো।'

'আচ্ছা।'

লাচি ষ্টেশন মাষ্টারের টেবিল থেকে ফিরে আসতে আসতে কথাটা এমনভাবে বললো যেন কেবল ষ্টেশন মাষ্টারের উপরই নয়, গোটা কিংডমের উপরই অনুগ্রহ দেখাচ্ছে। এবং নিজের নীলরঙের ফুলঅলা শার্টের দোলাতে দোলাতে নগ্নপদে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

ষ্টেশন মাষ্টারের কামরা থেকে বেরিয়ে লাচি এক নম্বর প্লাটফরমের উপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে গেটের দিকে চলে যেতে থাকলো। মানুষ-জন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। কারণ মানুষজন সব সময় তার দিকে তাকিয়েই থাকে। পুরুষরা আক্ষেপমাখা দৃষ্টিতে, মেয়েরা ঈর্ষার দৃষ্টিতে।

লাচি যাযাবরের মেয়ে। কত বংশ, জাতি আর রঙের সংমিশ্রণে যে সৌন্দর্যের এই অসাধারণ নমুনা তৈরী হয়েছে তার হিসেব নেই। বেশ লম্বা ভরাট শরীর, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, গাঢ় শ্যামল একজোড়া চোখ, বুক যেন এক জোড়া কামানের গোলা এবং ক্ষীণ কোমর নিয়ে সাঁতারের ভঙ্গীতে লাচি যখন হাঁটে তখন তার মনে হয় যেন সারা পৃথিবী তাকে মাথা নত করে সালাম করছে।

'এসব মেয়েদের সত্যি জেলে পুরে দেয়া উচিত।'

লাচিকে গেট দিয়ে বেরুতে দেখে ট্যাক্সী ড্রাইভার হামিদে বলে উঠলো।

হামিদে ট্যাক্সী ড্রাইভারদের সর্দার। ষ্টেশনের আশপাশ এলাকার সবাইর কাছে সে 'দাদা' বলে পরিচিত। ওসব এলাকার মদ, চরস, আফিং এবং মেয়ে মানুষের ব্যবসা তার মাধ্যমেই চলে। কালো চকচকে শরীরের বেঁটে হামিদে বেশ ফুর্তিবাজ যুবক। নিজেকে অনেক কিছু মনে করে। আর যারা ওকে অনেক কিছু মনে করে না সে তাদের দুরস্ত করতেও ছাড়ে না। ষ্টেশন মাষ্টার রেসক লাল স্বয়ং তাকে ভয় করে চলেন এবং প্রায়শঃ মান্য করেন।

কিন্তু লাচি হামিদেকে একদম ভয় করে না।

হামিদের কথা শুনে জবাবে লাচি জোরে তার দিকে থুথু ছুঁড়ে মারলো। তারপর কোমর দুলিয়ে পেট চুলকোতে চুলকোতে নিজের কালো জামার আস্তিন ঠিক করতে করতে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে ভিক্ষা করতে চলে গেলো। তখন বুরি-দিল্লী লোকেল ট্রেন দু'নম্বর প্লাট-ফরমে এসে থেমেছে। আর যাত্রীরা সবাই গেট থেকে বেরিয়েই ছুটতে ছুটতে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে লাইন লাগাতে শুরু করেছে।

লাচির থুথু ছোঁড়াতে হামিদের তেমন রাগ হলো না। দু'তিনবার সে ডর-ভয় দেখিয়ে লাচিকে নিজের কব্জায় আনতে চেয়েছিলো, কিন্তু প্রতিবারই তার মুখের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। খুব শীগগীর সে বুঝতে পারলো, খুব মজবুত শরীর লাচির। এবং সে যাযাবর

আর আওয়ারা কিসিমের এমন কিছু লোককে চেনে যাদের মাধ্যমে সে কোন লোককে পিটুনী দিতে পারে।

লাচি আর দশটা সাধারণ শহুরে কিম্বা গ্রাম্য মেয়ের মতো নয় যে পুরুষের একটা ঘুষা খেয়েই চাটাইর মতো হয়ে যাবে। লাচিকে উৎপীড়ন করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হামিদের আছে। এ জন্যই থুথু মারা সত্ত্বেও হামিদে লজ্জায় লাল হতে হতেও হেসে দিলো। এবং মুখ ঘুরিয়ে নিজের ট্যাক্সীর দিকে চলে গেলো।

লাচি হাঁটতে হাঁটতে মাধুর দোকান থেকে একটা আমরুত তুলে নিলো। এবং নিজের ধব ধবে সাদা মসৃণ মুক্তোর মতো দাঁত তাতে বসিয়ে দিলো। তারপর আমরুতটাকে কাঠবিড়ালীর মতো খেতে লাগলো।

লাচি খাচ্ছে আর মাধুর প্রতি দুষ্টুমীর কটাক্ষ হানছে। আর মাধু হতভম্ব হয়ে লাচির চেহারার প্রতি এমন ভাবে তাকাতে থাকলো যে রকম লোহা চুম্বকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তবে মাধু তখন ওর দিকে তাকিয়ে কি দেখছিলো তা বলা মুশকিল। তার ছেঁড়াফাড়া সেই দৃষ্টি জোড়ার মধ্যে কি পরিমাণ ক্ষুধা লুকিয়ে ছিলো কে জানে। সে তার ভেজা ঠোঁটজোড়া দিয়ে অনেক কষ্টে স্রেফ এই কথাটুকুন বললো ঃ

'আমরুতের পুরো টুকরিটাই নিয়ে যাও না!'

'হিঃ!'

লাচি আধা-খাওয়া আমরুতটাই তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো এবং সামনের দিকে এগিয়ে গেলো।

মাধুর দোকানের বারান্দা থেকে যখন লাচি বেরিয়ে এলো তখন সবেমাত্র শেষ বিকেলের অস্তমিত সূর্য তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব লাল চুল স্পর্শ করেছে। এবং লাচির মাথার চারপাশে স্ফুলিঙ্গের কম্পিত কম্পিত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে দিয়েছে। তা দেখে গরীব মাধুর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো ঃ

'মনে হচ্ছে যেন কোন শুকনো ঝোপঝাড়ে আগুন লেগেছে।'

পরে চুপি চুপি লাচির আধখাওয়া আমরুতটা হাতে তুলে নিলো সে এবং তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে লাগলো।

'তোর এঁটো খাচ্ছি রে লাচি!'

লাচি হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে বললো ঃ

'আমার থুথু লেগে রয়েছে।'

এবার লাচি বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে যাত্রীদের লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে গেলো। এবং সবার সামনে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা করতে শুরু করে দিলো।

'চশমাওয়ালা বাবু এক আনা —'

'ছাতাওয়ালী বিবি এক আনা—'

'বাণ্ডিলওয়ালা সর্দারজি এক আনা—'

যেন সে ভিক্ষা করছে না, লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে নিলামে বিক্রি করছে। সব মাল এক আনা।

এক বাবু লাচির দিকে চোখ মেরে বললো ঃ

'বারো আনা দেবো।'

'তোর মাকে দে।'

তরাখ করে জবাব দিলো লাচি এবং সামনের দিকে চলে গেলো।

এই পৃথিবীটা বড় কঠিন। যাযাবরদের জন্য তো আরো কঠিন। জমিতে গজিয়ে ওঠা চারাগাছের মতো যে লোক একই শহর কিম্বা গ্রামে বসবাস করে, তারা একে অন্যকে চেনে। খুশীর হাওয়ায় এক সাথে নাচতে নাচতে দোল খায়, গান গাইতে গাইতে বড় হয়। ক্ষুধার তাড়নায় এক সাথে যন্ত্রণা পায় এবং রোগের মহামারীতে এক সাথেই ঢলে পড়ে প্রাণ হারায়।

কিন্তু যাযাবরদের জন্য সব জায়গাই কঠিন। সব জমির সীমানাই ওদের জন্য অপরিচিত, সব গ্রামের পথঘাটই ওদের জন্য অচেনা। শহরের অলি-গলির প্রতিটি বাঁকই ওদের জন্য নিত্য নতুন বিপদসঙ্কুল। সব চৌরাস্তার সব সান্ত্রীই ওদের যে কোন মুহূর্তে বেদখল

করতে পারে। ওরা সব জায়গায়ই একা, নিঃসঙ্গ।

ওরা কোন বিশেষ জাতির, ধর্মের, বর্ণের বা দেশের নয়। অথবা ওরা সবার। এ জন্যই ওরা কারোই না। ওদের রঙে সবার রঙ, ওদের রক্তে সবার রক্ত মিশে আছে, এবং ওদের মুখের ভাষায় সবার ভাষা জড়িয়ে আছে। ওরা যে নিজেদের তাঁবু, চাটাই আর সামান্য খড়কুটো নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা কি নিজেদের কোন আস্তানা বা স্থায়ী ঘর খুঁজছে? নিজেদের পরিণতি ওরা নিজেরাই জানে না।

লাচি আপন গোত্রে তার চাচা মামনের কাছে থাকে। কারণ চাচা মামনের কাছে তার মা থাকে। তার মা চাচা মামনের কাছে থাকে এ জন্য যে, তার স্বামী রেগি একবার মদ খেয়ে তাকে নিয়ে জুয়া খেলেছিলো এবং হেরে গিয়েছিলো। তখন লাচির বয়েস চার বছর। এ জন্যই মার সাথে মেয়েও যখন চলে এলো তখন মামনে বড় খুশী হলো। কারণ যাযাবরদের গোত্রে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা বেশী রোজগার করে। পুরুষ সারাদিনে চার আনার একটা টুকরি তৈরী করে, কিম্বা তিন দিনে ন' আনার একখানা চাটাই বুনে।

কিন্তু মেয়েরা নকশি কাটা সিলকের ঘাগরা পরে, রেশমী চুলি গায়ে দিয়ে, চোখে সুরমা এঁটে, মুখে স্মিত হাসির রেখা ফুটিয়ে দৃষ্টিতে একরাশ আমন্ত্রণ নিয়ে অলিতে গলিতে গিয়ে বসে। এবং চশমা, বিভিন্ন ওষুধের অনুপান, বিভিন্ন পাথরের আংটি, কানের দুল, কাচের নকশা আঁটা হার ইত্যাদি বিক্রি করে। এবং প্রচুর রোজগার করে।

তা না হলে এসব সুন্দর সুন্দর কাপড়-চোপড়, হাই হিল জুতো, পারফ্যুম সুন্দর লাবণ্যময়ী শরীর কোথা থেকে আসে? কোন ফ্যাক্টরী থেকে তৈরী হয়ে তো আসে না।

এ ছাড়া যাযাবরদের অনেক যুবতী মেয়ে তাদের পুরনো ধান্ধাও করে। লাচিদের গোত্রের মধ্যে রাসি, জামা, প্রতি, সুন্নিয়ারা তো

তাই করে। সন্ধ্যা হতে না হতেই ষ্টেশন ইয়ার্ডের পশ্চিম দিকে যেখানে যাযাবররা তাঁবু গেড়েছে; বেশ কিছু মোটর গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ শহরে এমন চমৎকার সুন্দর জিনিষ অথচ দামও অপেক্ষাকৃত কম, আর কোথায় পাওয়া যাবে? সব মহাজনই চায় সুন্দর অথচ দামে সস্তা মাল খরিদ করতে।

(ধনী লোকদের রাতগুলো সম্পর্কে তোমরা কি আর জানো! সারাদিনের কত প্রতারণা, মিথ্যা প্রলোভন, নানানতরো ঝড়-ঝাপটা আর প্রবঞ্চনার পর, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবেককে কয়েকশ'-বার হত্যা করার পর তো এই রাত আসে। সেই রাতেও যদি হুইস্কির নতুন বোতল না পাওয়া যায় তাহলে অমন কাজের কপালে ঝাঁটা। উদরের নরক ভরানোর জন্য তো সব আহাম্মকই কাজ করে।

এ জন্যই রাত যখন আসে, প্রতিটি যাযাবরের ডেরায় সভ্যতার বাহন মোটর গাড়ীটিও সঙ্গে নিয়ে আসে। এবং খোলা হাওয়ায় লালিত-পালিত সুন্দর মনোমুগ্ধকর জঙলী ফুলগুলোকে পছন্দ করে নিয়ে যায়। বিংশ শতাব্দী আর প্রথম শতাব্দীর মধ্যে তখন আর কোন পার্থক্য থাকে না। আর এই সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার মুহূর্তে ওরা যা কিছু হারিয়েছে তা ফিরে পাবার জন্য কসরত করে। এবং যারা ফিরে পায় তারা আবার হারাবার পাগলামোতেই রাত শেষ করে।)

এবং রাত শেষ হলে মোটর গাড়ীগুলো যার যার অফিসে ফিরে যায়। আর গরীব যাযাবর মেয়েরা আবারো যথারীতি ফুটপাথে লোক জমিয়ে চশমা বিক্রি করে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে, এ সময় লাচি আপন তাঁবুতে ফিরে এলো।

ষ্টেশন ইয়ার্ডের পশ্চিম দিকে যাযাবরদের তাঁবু।.....

লাচি রেলওয়ে ইয়ার্ডের লোহালক্কড়ের স্তূপ এক লাফে পার হয়ে

'জোহরে'র ধার ঘেষে হাঁটতে হাঁটতে একটা টিলার কাছে এসে দেখলো তার বাবা রেগি টিলার উপর বসে বসে আপন মনে পাথর নিয়ে খেলছে। যদিও লাচির দিকে পিঠ দিয়েই বসেছিলো রেগি, কিন্তু লাচি জানে তার বাবা তাকে দেখে ফেলেছে। সে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় রেগি নীরবে সামনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলো।

বেশ কিছুদিন থেকে এ নিয়ম চলে আসছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে রেগি টিলার উপর গিয়ে বসে। এবং মেয়ের প্রতীক্ষায় থাকে। লাচি যখন তার কাছ ঘেষে চলে যাচ্ছিলো তখন রেগি নিঃশব্দে হাতখানা বাড়িয়ে দিলো।

লাচি পকেট হাতড়ে চার আনা পয়সা বের করে রেগির হাতের উপর রেখে দিলো। এবং পরে নিঃশব্দে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। বাবা আর মেয়ের মধ্যে কোন কথাবার্তা হলো না। যেদিন রেগি জুয়োয় মা-মেয়ে দু'জনকেই হারিয়ে বসলো, সেদিন থেকেই বাবাকে ঘৃণা করতে থাকলো লাচি।

রেগি বড়ই দুর্বল আর নিকম্মা মানুষ। তবে দাফ্ (এক রকম বাদ্যযন্ত্র) বাজানো, নাচ-গান আর মদ পানে তার জুড়ি নেই। তার গলার স্বর বেশ দরাজ আর সুরেলা। সুন্দর টুকরি বানাতে জানে। কিন্তু কাজের প্রতি কেমন যেন একটা ঘৃণাভাব তার। যাযাবরদের মধ্যে তার পোশাক-আশাকই সব চেয়ে বেশী ময়লা, ছেঁড়া-ফাঁড়া। ময়লা শতচ্ছিন্ন পোশাক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ী। তার তামাটে রঙের চেহারায় এক অদ্ভুত দুষ্টুমী সব সময় খেলা করে। সিকিটা নিয়ে নিজের পুরনো বাস্কেটে রেখে দিলো সে। এবং পরে পাথর নিয়ে আবার পুরনো খেলা জুড়ে দিলো রেগি।

কতবার লাচির ইচ্ছে হলো বাবাকে তার রোজগারের একটা পয়সাও না দেয়, পরিবর্তে তার দুষ্টুমী ভরা চেহারার উপর পাথর ছুঁড়ে মারে। কিন্তু প্রত্যেকবারই এক অজানা আবেগ এসে তার হাত থামিয়ে দেয়। ফলে বাবার কালো লোমশ হাতের উপর সিকি আধুলিটা ফেলে দিতে বাধ্য হয় লাচি।

হ্যাঁ সামনে এগিয়ে আপন তাঁবুতে ফিরে যাবার সময় লাচি সব

সময়ই ভাবে, কেন এমন হয়? ওর মুখের উপর পাথর ছুঁড়ে মারতে পারে না কেন সে? এই পৃথিবীতে সব আবেগই তার ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয় কেন?

সে একটা ছোট পাথরকে নিজের নগ্ন পা দিয়ে ধাক্কা মারলো এবং সামনের দিকে ছুটতে থাকা পাথরের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে আপন তাঁবুতে পৌঁছে গেলো।

তাঁবুর কাছে পৌঁছেই সে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো।

তাঁবুর বাইরে একটা চাটাই পেতে তার চাচা মামনে এবং গোত্রের সর্দার দুমারু মাটির পাত্রে করে ঠারা (নিজেদের হাতের তৈরী এক রকম মদ) পান করছে। আর তাস খেলছে। লাচির মা স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে তাস দেখছে আর পরামর্শ দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে মামনের পাত্র তুলে এক এক চুমুক পান করছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দু'জনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও মামনে শুধু হারছে। এবং কৃষ্ণ-কালো দীর্ঘ নাসিকার অধিকারী দুমারু সর্দারের চেহারায় সাফল্যের একরাশ শয়তানী চমক দেখা দিলো।

লাচির পায়ের শব্দ শুনে তিনজনই ফিরে তাকালো লাচির দিকে। দুমারুর চেহারায় কামনার চমক নেচে উঠলো। মামনের মাথার চুল সব জ্বলে উঠলো বুঝি। মামনের স্ত্রী একটা শুকনো হাসি দিয়ে ঝোলাটা লাচির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। লাচি পকেটের সব খুচরা পয়সা বের করে মার ঝোলায় ঢেলে দিলো। এবং লাফাতে লাফাতে তাঁবুর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

'আমাকে দিয়ে দে কওলী।'

মামনে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্ত্রীকে বললো।

'থাম হতভাগা, গুণতে দে আগে।'

কওলী রেজ্‌গী গুণতে গুণতে বললো।

'গুণে কি করবি?' মামনে ঘৃণাভরে বললো, 'হবে পনের বিশ আনা! তার থেকে আবার চার আনা তোর আগের খসমকে দিয়ে এসেছে হয়তো……।'

'আর তুমি যে এই জুয়া খেলছো, মদ খাচ্ছো, মাছ খাচ্ছো—এসব কার কামাই, কার পরিশ্রমের রোজগার খাচ্ছো?' হঠাৎ রেগে গিয়ে কওলী স্বামীর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

মামনের স্ত্রী ঠিকই বলেছে। একেবারে আসল খোঁটা দিয়েছে। আধবয়সী হয়ে গেছে, এরপরও সে এতো সুন্দরী যে, মন লাগিয়ে শিকার করলে এখনো আট দশ টাকা বাগিয়ে আনতে একটুও বেগ পেতে হয় না তার। কিন্তু এখন আর মন চায় না। ঘরে যুবতী মেয়ে থাকলে কোন্ মার মন চায় এসব ধান্দা করতে! চিন্তা করার বিষয়। কার মন চায় না একটু আরাম করতে?

কিন্তু আজ বড় বিশ্রীভাবে মামনের ইচ্ছে করছে মদ খেতে, জুয়া খেলতে। এবং লাচির মাকে বড় অস্থির করে মারছে, যেন কোথাও না কোথাও থেকে একটা ব্যবস্থা করে দেয় সে। আর এ তো দু'জনেই জানে, লাচি মরে যাবে, তবুও ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করবে না। তাই সব কিছুর ব্যবস্থা অসহায় মাকেই করতে হলো।

এজন্যই ঠাররা পান করতে করতে লাচির মার কাছেও মনে হলো যেন বিষ পান করছে সে। লাচির উপর বড় রাগ ধরে গেলো তার। কিন্তু মামনের কথাও সে সহ্য করতে পারছিলো না।

স্ত্রীর কথা শুনে মামনে চুপ হয়ে গেলো বটে, কিন্তু তার বুকে ক্রোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকলো। সে আগুনে ইন্ধন যোগাতে যোগাতে বললো দুমারু:

'যুবতী মেয়ে হলো গিয়ে সোনার কান। তার উপর লাচির মতো অমন সুন্দরী মেয়ে···!'

তৎক্ষণাৎ লাচি বলে উঠলো:

'তুমি আমাকে কয়লার কান মনে করো আর পাথরের কান মনে করো, ধান্ধা আমি করবো না—ব্যাস।'

'তুমি মাঝখানে ফোঁড়ন কেটো না—' মামনের স্ত্রী লাচির উপর ক্ষেপে উঠে বললো, 'যাও মাছগুলো ভাজি করে নিয়ে এসো।'

লাচি তাঁবুর এককোণে মাছ ভাজতে বসে গেলো। আগুনের লেলিহান শিখা ওকে আরো সুন্দরী লাবণ্যময়ী করে তুললো।

দুমারু সর্দার ওকে গোপনে বার বার দেখে নিচ্ছিলো। আজ দুমারু সর্দার খুশী, বহুত খুশী, সম্মানে জিতে যাচ্ছে সে আজ।

ঠাররা শেষ হতে হতে রাত অনেক হয়ে গেলো। লাচির চোখ ভেঙ্গে ঘুম নামতে লাগলো এবং প্রদীপের শিখাও আস্তে আস্তে বুজে আসতে লাগলো। তখন ওরা জুয়া বন্ধ করলো। মামনের স্ত্রী হিসাবপত্র করে দেখলো পঞ্চাশ টাকার মতো হারতি আছে মামনের।

মামনে পকেট হাতড়ে স্রেফ দশ আনা পয়সা খুঁজে পেলো।

'দশ আনা কম পঞ্চাশ!' দুমারু তীক্ষ্ণ স্বরে বললো এবং হাত বাড়িয়ে দিলো, 'দাও।'

মামনের স্ত্রী উঠে তাঁবুর ভেতরে চলে গেলো এবং যখন ফিরে এলো তখন তার হাতে মাত্র টাকা তিনেকের মতো ছিলো।

'তিন টাকা দশ আনা কম পঞ্চাশ!' দুমারু আবারো চেঁচিয়ে উঠলো।

'আমার দাফ্ নিয়ে নাও, ঝাঁঝর নিয়ে নাও।' মামনের স্ত্রী বললো।

দুমারু অবজ্ঞার হাসি হাসলো, বললো:

'আমি তো সোনালী চুলের লাচিকেই নেবো।'

'স্রেফ পঞ্চাশ টাকায়? অসম্ভব!' মামনে মাথা নেড়ে বললো।

দুমারু পকেট থেকে আরো পঞ্চাশ টাকা বের করলো। বললো, 'যাও ওই পঞ্চাশ টাকা মাফ করে দিলাম। এই নাও আরো পঞ্চাশ টাকা। এবার বলো?'

একশ' টাকা তার জন্য অনেক। মামনের লোভ লেগে গেলো। সে তার স্ত্রীর দিকে তাকালো।

স্ত্রী মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো।

মামনেও দুমারুর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে না করে দিলো।

'একশ' পঞ্চাশ—'

দুমারু আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিলো।

দু'শ টাকা তখন মামনের সামনে পড়ে আছে। ওর হাতের

আঙ্গুলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো। বড় অস্থির আর ব্যাকুল ভাবে সে স্ত্রীর দিকে তাকালো।

কিন্তু তার স্ত্রী পুনরায় মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো।

'আড়াইশ'!' দুমারু রাগে চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'আজ আমি লাচিকে ঘরে নিয়েই ফিরবো।'

আড়াইশ' টাকা দেখে মামনে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। সামনে হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

কিন্তু তার স্ত্রী আবারো তার হাতখানা সরিয়ে দিলো।

দুমারু পকেট হাতড়ে সর্ব শেষ শতি নোটখানা বের করলো—সবুজ রঙের শতি নোট দেখে মামনে আর তার স্ত্রীর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। দুমারু তাদের গোত্রের সর্দার তা জানে, কিন্তু এতো বড় ধনী তা তাদের জানা ছিলো না। তাকে দেখতে তো অবিকল তাদের মতোই মনে হতো।

মামনের স্ত্রী অস্ত্র সংবরণ করলো।

মামনে সাড়ে তিনশ' টাকার নোট তুলে নিজের পুরনো বাক্সেটে ভরে ফেললো।

এ সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো ঃ

'দাঁড়াও।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো লাচির বাবা রেগি দাঁড়িয়ে আছে। তার তামাটে রঙের চেহারায় একরাশ অর্থময় দুষ্টুমী খেলা করতে থাকলো।

প্রত্যেকের মনোযোগ এবার তার প্রতিই নিবদ্ধ, লক্ষ্য করে সে বললো ঃ

'বেচা-কেনা তো বেশ ভালোই হলো কওলী!'

রেগি তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর প্রতি কৌতুক মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো ঃ

'বাবা সত্তর টাকার জন্য নিজের স্ত্রী হারালো। স্ত্রী তার মেয়ের বিনিময়ে সাড়ে তিনশ' টাকা আদায় করে নিলো।

'তারপর—?'

মামনের বউ জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। ওর সে চিৎকারে একটা

বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ প্রকাশ পাচ্ছিলো যেন।

রেগি বড় কোমল স্বরে বললো ঃ

'আমি লাচির বাবা। আমি তাকে লালন-পালন করিনি ঠিক, কিন্তু ওর ধমনীতে যে রক্ত বইছে সে রক্ত যে আমার।'

'কে বলতে পারে— ?'

মামনের বউ জোরে হেসে উঠলো।

রেগি কথাটা শুনেও না শোনার মতো করে বললো ঃ

'আমার অংশ আমাকে পেতেই হবে।'

'নে, বিশ টাকা তুইও নে।'

দুমারু নিজের পকেট থেকে বিশ টাকা দিতে দিতে বললো। সে লাচির ব্যাপারে কোন রকমের ঝগড়া-ফ্যাসাদ চায় না।

রেগি বিশ টাকা পকেটে রাখতে রাখতে দুমারুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো, বললো ঃ

'এতো টাকা তো যাযাবরদের রাণীর কাছেও নেই, তুমি পেলে কোথায় ?'

'জাল টাকা নয় এগুলো।' দুমারু বড় গর্বভরে জবাব দিলো, 'যাকে খুশী দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারো। বেশী প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই তোমার।'

'না সর্দার !'

রেগি ভদ্রভাবে বললো।

'তাহলে বেচা-কেনা পাকা ?'

দুমারু আর একবার সবাইকে জিজ্ঞেস করে নিলো।

'পাকা—!'

সবাই স্বীকৃতি জানিয়ে মাথা নাড়লো।

এরপর উভয় যাযাবর পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। দুমারু মামনের বউর হাতে চুমু খেয়ে বললো ঃ

'আমি তোর প্রতি আসক্ত ছিলাম, মনে পড়ে ? কিন্তু তোর বাবা তোকে আমার কাছে বিক্রি না করে রেগির হাতে তুলে দিয়েছিলো।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর দুমারু মামনের বউকে আস্তে করে

জিজ্ঞেস করলো, 'লাচি কোথায় ?'

'তাঁবুতে শুয়ে আছে হয়তো।'

দুমারুর জন্য সবচাইতে কঠিন অবস্থা সামনেই অপেক্ষা করছিলো। গোত্রের রীতি অনুযায়ী দুমারুকে এখন তাঁবুর ভেতরে ঢুকে লাচিকে নিজের দু'বাহুতে উঠিয়ে আপন তাঁবুতে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু লাচি তো আর পাতলা ছিপছিপে ফুলকুমারী না, বেশ ভালো শক্ত-সমর্থ, ভরাট শরীরের যুবতী মেয়ে। আর দুমারু হলো বুড়ো।

'ওকে ডেকে তোল, অথবা ওকে তুলে বাইরে নিয়ে এসো, এবং সব কথা খুলে বলো।'

দুমারু দুর্বলস্বরে বললো।

রেগি দুষ্টুমী মাখা স্বরে বললো ঃ

'এটা ভুল কথা। রীতি তো পালন করতে হবে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে মেয়েকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোল। ও যদি বাধা দেয় তার সাথে বুঝা-পড়া করো। ওকে দু'বাহুতে তুলে তোমার তাঁবু পর্যন্ত নিয়ে গেলেই লাচি তোমার, তা না হলে……'

কিন্তু মামনে রেগির চালাকি ধরে ফেললো। সে কোন রকমের ঝগড়াই চায় না। লাচি ধান্ধা তেমন করে না বললেই চলে। যা রোজগার করে, তার সবটা নিজের জন্যই খরচ করে ফেলে। সুতরাং এমন ঘোড়া রেখে তার ফায়দা কি, যে কিনা পাছায় একটু হাত রাখতেও দেয় না। অথচ ঘাস ঠিকই খেয়ে যাচ্ছে। তেমন সৌন্দর্য দিয়ে কি হবে! ভালোই হয়েছে ছুড়িটার জন্য সাড়ে তিনশ' টাকা আদায় করে নিয়েছে, তা না হলে তো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করতে পারলেও মন্দ হতো না!

এ জন্যই মামনে দুমারুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'চলো তোমার সাথে আমিও যাচ্ছি তাঁবুর ভেতরে, দেখি কি করে শূয়রের বাচ্চা……'

মামনে আর দুমারু দু'জনেই এক সাথে ঘুরে তাঁবুর দিকে পা

বাড়ালো। এবং পর মুহূর্তেই দু'জন অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

তাঁবুর ঝুলানো পাল্লা উপরে তুলে লাচি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে রূপোর হাতল-অলা খঞ্জর। এবং তার গাঢ় সবুজ এক জোড়া চোখ সমুদ্রের মতোই বিক্ষুব্ধ।

'কে আমাকে বিক্রি করেছে?'

লাচি এক হাতে খঞ্জর উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

রেগি, মামনে, দুমারু তিনজনই চুপ করে থাকলো। রেগি নিজের পা জোড়া এদিক ওদিক করলো মাত্র। মামনে দৃষ্টি জোড়া অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। আর দুমারু নিতান্তই হতভম্ব হয়ে লাচির দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু তিনজনের কেউই কোন কথা বললো না।

লাচির মা বললো:

'মেয়ে মানুষ, মাদী ঘোড়া আর জমি সব সময় বিক্রি হয়। তোকে সর্দার দুমারু খরিদ করে নিয়েছে।'

'লাচি! তোর জন্য আমি সাড়ে তিনশ' টাকা দিয়েছি।'

দুমারু সামনের দিকে এক পা বাড়িয়ে লাচিকে বলতে লাগলো।

'খবরদার! আমার দিকে এক পাও এগুবে না বলছি।' লাচি ওখানে দাঁড়িয়েই শূন্যে খঞ্জর নাড়তে লাগলো।

দুমারু পেছনে সরে গেলো।

'মা, সর্দারের পয়সা ফিরিয়ে দে।'

মা জোরে হেসে উঠলো।

তার বিদ্রূপাত্মক হাসির আড়ালে লুকিয়ে-থাকা অস্বীকৃতি তীরের মতো লাচির বুকে বিঁধে গেলো। দু'কদম সামনে এগিয়ে এলো সে। পরে আরো দু'কদম। তারপর কি চিন্তা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দুমারুর একেবারে কাছে চলে এলো।

খঞ্জর তখনো তার হাতে ধরা। দুমারুর কাছে এসে খঞ্জরটা তার একেবারে মুখের উপর খাড়া করে ধরে বললো:

'যদি সাহস থাকে আমাকে তুলে নিয়ে যাও। আমি নিজে হেঁটে যাবো না। কারণ তোমার ওই লম্বা নাক-অলা উটপাখীর মতো চেহারাকে আমি ঘৃণা করি।'

দুমারু রাগে বেসামাল হয়ে পড়লো। এবং পলট খেয়ে বিদ্যুতের মতো লাফিয়ে লাচিকে দু'বাহুতে তুলে নিজের তাঁবুর দিকে নিয়ে চললো।

দুমারুর দু'বাহুর ভেতরে লাচি ছটফট করতে থাকলো। তার খঞ্জর হাওয়ায় দোল খেতে খেতে দুমারুর বুকের ভেতর বিঁধেই যাচ্ছিলো প্রায়। কিন্তু দুমারু এ সময় নিজের দু'টি বাহু ছেড়ে দিলো। আর লাচি ধড়াম করে নীচে পড়ে গেলো। খঞ্জরটা হাতল পর্যন্ত মাটিতে গেঁথে গেলো।

মামনে ছুটে গিয়ে খঞ্জরটা মাটি থেকে তুলে নিজের হাতে নিয়ে নিলো। লাচি খঞ্জর নিতে এগিয়ে গেলে মামনে এক হাত দিয়ে জোরে ঝটকা মারলো, যেটা লাচির ঘাড়ে গিয়ে লাগলো। আর লাচি দুমারুর গায়ের উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। দুমারু ওকে আবারো শক্ত করে নিজের দু'বাহুতে বেঁধে ফেললো। কিন্তু লাচি সুচতুর নটিনীর মতো তার দু'বাহুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সরে গেলো।

দুমারু আবার তাকে ধরে ফেললো। এবং দু'টো ঘুষা মেরে মাটিতে ফেলে দিলো। তারপর চুল ধরে তাকে মাটিতে হ্যাঁচড়াতে শুরু করে দিলো।

লাচি ওর হাত ধরে ফেললো। এবং সামনের দিকে হ্যাচকা টান মারলো। দুমারু টাল সামলাতে না পেরে লাচির উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আর লাচি সাপের মতো মোচড় খেয়ে পলকে দূরে সরে গেলো এবং দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর দু'হাত কোমরে রেখে বললো ঃ

'এসো সর্দারজি, আমাকে তুলে নিয়ে যাও।'

দুমারু কনুইয়ে আঘাত পেয়েছে। তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও দ্রুত

বইতে শুরু করেছে। কিন্তু রাগে তার সারাশরীর যেন জলতে থাকলো। সে আবারো সামনের দিকে এগিয়ে গেলো।

আশ্চর্যের কথা হলো, এবার কিন্তু লাচি মোটেই বাধা দিলো না। ফুলের মতো তাকে দু'বাহুতে তুলে নিলো দুমারু। এবং নিজের তাঁবুর দিকে নিয়ে চললো।

দু'চার কদম যেতে না যেতেই লাচি কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করেই তার দু'বাহুর বন্ধন থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে গেলো যেরকম চালুনি থেকে পানি গড়িয়ে যায়। লাচি আবারো মাটিতে পড়ে গেলো এবং অসহিষ্ণু দৃষ্টিতে দুমারুকে দেখতে লাগলো।

দুমারু আবারো সাহস সঞ্চয় করে লাচিকে নিজের দু'বাহুতে তুলে নিলো। এবং আপন তাঁবুর দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। এবার অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করলো দুমারু।

অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করার পর লাচি আবারো এক লাফে তার দু'বাহু থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। এবং নিজের তাঁবুর দিকে পালিয়ে যেতে লাগলো। দুমারু তার পেছনে পেছনে ছুটলো, তাঁবুর কাছে গিয়ে সে লাচিকে ফের ধরে ফেললো। কিন্তু লাচি ঝুকে দুমারুর দু'পায়ের ফাঁকে মাথা গলিয়ে তাকে এমন পটকানি মারলো যে, পর মুহূর্তে দেখা গেলো দুমারুর মাথা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর পা দু'টো শূন্যে ঝুলছে।

দুমারু কাপড় ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এবং উন্মাদের মতো হাঁফাতে হাঁফাতে বানরের মতো চিৎকার দিয়ে লাচিকে আক্রমণ করলো।

লাচি তাকে আবারো একটা পটকানি মারলো।

দুমারুর দম বন্ধ হয়ে এলো যেন। শেষবার পটকানি খেয়ে সে আর মাটি থেকে উঠতেই পারলো না। ওখানেই কাত হয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলো।

এবার লাচি সামনে গিয়ে তাকে দু'বাহু ধরে টেনে দাঁড় করালো এবং নিজে স্বয়ং তার দু'পায়ের নীচে বসে পড়লো। তারপর বড় নাটকীয় ভাবে নিজের দু'টি হাত তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো ঃ

'আমার সর্দার, আমাকে তোমার তাঁবুতে নিয়ে চলো।'

এ কথায় দুমারু তাকে জোরে কষে একটা লাথি মারার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই লাচি মাটিতে শুয়ে পড়লো এবং গড়াগড়ি খেতে খেতে অনেক দূরে চলে গেলো। আর দুমারু টাল সামলাতে না পেরে আবারো মাটিতে পড়ে গেলো।

লাচি জোরে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এবার তো দুমারুর অবস্থা দেখে মামনে আর তার বউও থাকতে পারলো না। তারাও জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

দুমারুর বড্ড রাগ ধরে গেলো। সে বললো ঃ

'মামনে, তোমরা ওকে সাড়ে তিনশ' টাকার বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করেছো। হয় মেয়েকে আমার হাতে তুলে দাও, নতুবা আমার টাকা ফেরত দাও।'

মামনে বললো ঃ

'টাকা পাওয়া যাবে না।'

মামনের বউ বললো ঃ

'মেয়ে পাবে, একটু ধৈর্য ধরো।'

লাচি বললো ঃ

'টাকা পেয়ে যাবে। আমার আশা ছাড়ো।'

দুমারুর সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, হাড়ের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা ধরে গেছে। ব্যথায় কঁকাতে কঁকাতে সে বললো ঃ

'তোমার আশা কি এমনি ছেড়েছি! আমার টাকা ফেরত দাও।'

মামনের বউ বললো ঃ

'টাকা পাবে না।'

'তাহলে মেয়ে দাও।'

'মেয়েও পাবে না।' লাচি বললো।

'তাহলে মেয়ে দাও' দুমারু বললো, 'তা না হলে ব্যাপারটা কিন্তু আমি পঞ্চায়েতের কানে তুলবো। সমাজ থেকে তোমাদের বের করে দেবো।'

শহরে আজকাল কাউকে সমাজ থেকে বহিকার করে দেয়াটা

খুব একটা ঘৃণার কিম্বা দোষের নয়। কিন্তু কোন যাযাবরের জন্য গোত্র বা সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটা বড় মারাত্মক, কেয়ামতের চেয়েও কম না।

সুতরাং মামনে ভয়ে কেঁপে উঠলো। বউকে বললো ঃ

'টাকা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

লাচির মা বললো ঃ

'না—কিছুতেই না! এই কুত্তিটার জন্য সাড়ে তিনশ' টাকা আর কে দেবে?'

লাচি মার দিকে তাকালো এবং বললো ঃ

'মা, আমি না তোর মেয়ে!'

'যেই হও না কেন, দুমারু টাকা ফেরত পাবে না। আমি মেয়ে বেচে দিয়েছি। ভদ্ররা একবার যে সওদা করে তা আর ফেরত দেয় না। সওদা সওদাই।

'হ্যাঁ, তা ঠিক। সওদা—সওদাই।' মামনে বললো, 'আমরা মেয়ে বেচে দিয়েছি। তুমি লাচিকে নিয়ে যাও।'

'কিন্তু আমি লাচিকে নেবো কি ভাবে?'

দুমারু এক অদ্ভুত বিরক্তিমাখা স্বরে বললো।

লাচি উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে খুন হয়ে গেলো। তারপর দুমারুর গলার স্বর নকল করে বললো ঃ

'যেভাবেই হোক আমাকে নিয়ে যাও, আমার প্রভু।'

'শূয়রের বাচ্চি!' দুমারু ক্রোধান্বিত হয়ে বললো।

'শূয়রের বাচ্চা!' লাচি বড় আদরমাখা স্বরে বললো।

দুমারু কিছু একটা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলো।

অবশেষে বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে দুমারু লাচির একেবারে কাছে চলে এলো। এবং বিমর্ষভাবে বলতে লাগলো ঃ

'আমি তোমাদের উপরই মীমাংসার ভার দিলাম। তুমি মীমাংসা করো, আমার কোনটা পাওয়া উচিত, লাচি না সাড়ে তিনশ' টাকা? তুমি যা বলবে আমি মেনে নেবো।'

লাচির হাস্যোজ্জ্বল গাঢ় সবুজ চোখজোড়া গাম্ভীর্যের গভীর

অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। সে মা আর চাচার লোভী চেহারার দিকে তাকালো, পরে দুমারুর আশায় দোদুল্যমান চেহারার দিকে। দুমারুর প্রতি তার মনে সহানুভূতি জেগে উঠলো। বললো ঃ

'তুই হাজার টাকা ফিরে পাবি।'

'কবে ?'

'যখন আমাদের গোত্র বসন্ত উৎসব পালন করবে।'

'কিন্তু উৎসব তো তিন মাস পরে হবে। ততদিন আমি কি করবো ?'

'আমি তিন মাসের মধ্যেই তোর টাকা মিটিয়ে দেবো।'

'যদি না মিটাও ?'

'তাহলে আমি তোর কাছে চলে আসবো। তোর গোলাম হয়ে থাকবো। তুই যা বলবি তাই করবো।'

দুমারু লাচির সুন্দর চেহারার দিকে তাকালো। খুশীতে তার হৃদয় কাঁপতে থাকলো। এবং পরে মৃদুস্বরে বললো ঃ

'খোদা করে, তুই যেন টাকা ফেরত দিতে না পারিস !' বলেই দুমারু দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে চলে গেলো।

মামনে আর তার বউ তাঁবুর বাইরে শুয়ে আছে। লাচি শুয়ে আছে ভেতরে। কিন্তু আজ লাচির চোখে ঘুম নেই। অনেকক্ষণ ধরে সে তাঁবুর জালি দিয়ে বাইরের আকাশ দেখতে থাকলো। তার মনটা দূর আকাশের মিটিমিটি জ্বলতে-থাকা নক্ষত্রের মতো ঈষৎ কাঁপছে।

হে রহস্যময় আকাশ, তুমিই বলে দাও আমি কি চাই !

আমার মন আর দশটি যাযাবর মেয়ের মতো নয় কেন ? কেন আমি ধান্ধা করতে পারি না, রোজগার করতে পারি না, নিজের দেহ বিক্রি করতে পারি না ? আমি তো অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে অনেক সুন্দরী, কিন্তু আমার মনটা এরকম কেন ? কেন আমার মন নিজের গোত্রের নিয়ম-কানুন, শত শত বছরের পুরনো রীতি-

নীতিকে অস্বীকার করতে চায়? কেন আমার মন তাঁবুর পরিবর্তে ঘর চায়, সংসার চায়?

বাস যখন ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায় তখন আঁকাবাঁকা লাইনে অনেক অনেক যাত্রী দাঁড়িয়ে থাকে, হাতে বিভিন্ন মালপত্রে বোঝাই থলে নিয়ে, ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে ওরা ঘরে ফেরার প্রতীক্ষা করে। এসব যাত্রী একই বাসে, একই পথে, নিজেদের একই ঘরে ফিরে যায়। আর আমরা যাযাবররা বিভিন্ন পথে হাঁটতে হাঁটতে, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে কোন্ ঘরে যাই?

এ রকম কেন?

হে নির্বাক নিশ্চুপ আকাশ, ক্লান্ত শ্রান্ত উন্মুক্ত নীল আকাশ, কিছু একটা বল, এভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থেকো না, আমার মনের আকাশে এতো ঝড় কেন, কেন এতো উত্তাল তরঙ্গ, বল?

কেন আমি চাই আমার জন্যও কোন উদাস মানুষ বাসের এই লম্বা উদাস লাইনে থলে হাতে দাঁড়িয়ে থাকুক? এবং সারাক্ষণ শুধু আমার কাছে এসে পৌঁছার জন্য ছটফট করুক?

ওরা আমাকে সব সময় দেখে। মাঝে মধ্যে কারো কারো দৃষ্টি আমার উপর এসে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু স্রেফ দৃষ্টি, ফুসলানো দৃষ্টিটাই আমার হয়, মানুষটা আর আমার হয় না। আমি চাইলে নিজের তাবৎ রূপ আর যৌবন দিয়ে তার জীবনের কয়েকটা ঘণ্টা, দিন আর মাসও ছিনিয়ে নিতে পারি। কিন্তু হলে কি হবে মানুষটা তবু আমার হবে না।

যেভাবে ওরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে এবং বাসের প্রতীক্ষা করছে, যে ছবি ওদের চোখে-মুখে ভাসছে এবং যে কল্পনা ওদের মনে খেলা করছে এবং যেভাবে যত্ন করে ওরা বউয়ের জন্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে তা দেখে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। ইচ্ছে করে বাসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি মানুষের মুখে নখের আঁচড় বসিয়ে দিই।

ওরা একরাশ ক্লান্তিতে ভরা, বিমর্ষতার উদাসীনতায় ভরা চেহারা নিয়েও ভেতরে ভেতরে কত খুশী। যে রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘ

থেকে বিদ্যুৎ চমকায়, যে রকম ময়লা দুর্গন্ধময় তাঁবুর ছিদ্র থেকে বসন্তের সৌরভ ছড়ায়, তেমনি এসব মানুষের কালো ময়লা ঘামে ভেজা চেহারাও একরাশ মোমের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিসের কল্পনায় ওদের চেহারা ফুলের মতো হেসে উঠে, যেখানে আমি ভিক্ষা করতে করতে লজ্জায় অধোবদন হয়ে যাই……। এবং একরাশ যন্ত্রণায় বুকটা ফেটে যায়।

আহা, আমার জন্যও যদি কেউ এরকম ক্লান্ত শ্রান্ত হতো, ব্যথায় চূর্ণ বিচূর্ণ হতো, এবং পকেটে যদি পয়সা নাও থাকে, হাঁটতে হাঁটতে যে কোন বাগান থেকে একটা ফুল হলেও ছিঁড়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হতো।

আরে, এ কেমনতরো মন আমার?

আর দশটা যাযাবর মেয়ের চাইতে কত আলাদা আমার এ মন!

যে কিনা আপন গোত্রেই থাকে, এ তাঁবু থেকে সে তাঁবু, এ শহর থেকে সে শহর, এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে ঘুরে ফিরে। যাদের জীবনের জন্য থাকে এক স্বামী এবং রাত বা কয়েক ঘণ্টার জন্য থাকে আরেক স্বামী। এবং উভয় স্বামীর মধ্যে কোন রকমের সংঘর্ষ বা ঝগড়া ফ্যাসাদ হয় না।

বরং প্রথম স্বামী খুশী মনে বউকে নিজের মন মতে করে সাজিয়ে-গুজিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়, যেখানে সে একরাত কিম্বা কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসে। এবং এমন ভাবে রাত কাটিয়ে ফিরে আসে যেন সে নিজের দেহ নয়, একটা চশমা কিম্বা আংটি বিক্রি করে এসেছে। তারপর নিজের সব রোজগার স্বামীর পায়ের নীচে উপুড় করে দিয়ে স্বামীর বুকের সাথে লেপ্টে যায়।

আমার শরীরটা কেন চশমা কিম্বা আংটি নয়? কেন ওটাকে আমার হৃদয়েরই একটা অংশ বলে মনে হয়? যার অবমাননা আমি একদম সহ্য করতে পারি না!

হে নগ্ন আকাশ, বিশ্রী, ময়লা, অপবিত্র কালো আকাশ!

কেন তুমি আমাকে যাযাবর গোত্রে জন্ম দিলে?

জন্মই যখন দিলে মনটাও তাদের মতো করে দিলে না কেন, যা কিনা প্রতিটি মুহূর্তে শুধু নিত্য নতুন জায়গার লালসা নিয়ে ফেরে।

আমি তো বৃক্ষের মতো একই জায়গায় গেড়ে বসতে চাই—একই জায়গায় আমার ঘন পল্লব ছায়া বিস্তার করুক, একই জায়গায় আমার ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ুক, এবং আমার ফল রূপে-রসে ভরে উঠুক। ওখানেই আমার বসন্ত আসুক, ওখানেই আমার পাতা ঝড়ার দিন। এবং ওখানকার শীত-গ্রীষ্ম গায়ে মেখেই আমি ওখানকার মাটিতে চির নিদ্রায় শুয়ে থাকতে চাই।

কিন্তু এসব চলন্ত তাঁবু, পরিবর্তনশীল মানুষ আর ছুটতে থাকা দৃশ্যাবলী—? নরক—স্রেফ নরক!

নিজের চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া লাচি ধীরে ধীরে দুঃখের ভারে ফোঁপাতে লাগলো।

লাচি এমন অদ্ভুত মেয়ে, যে থাকে এক পরিবেশে, চিন্তা করে অন্য পরিবেশের।

লাচি এমন সুন্দরী মেয়ে, যদি সে মেয়ে না হতো, তাহলে আপেলের গাছ হতো, হিমালয়ের কুমারী বরফে ঢাকা সুউচ্চ চূড়ো হতো, অথবা সমুদ্রের গভীর তলদেশে স্বপ্নের তৈরী গোলাপী মহল হতো।

কিন্তু প্রকৃতি তাকে নারী এবং পরিবেশ আর ঘটনাচক্র তাকে যাযাবর বানিয়ে দিয়েছে। এবং এই তিনটা জিনিষও এমন যে, কখনো এরা মানুষের সাথে সুবিচার করে না। প্রকৃতি—পরিবেশ—ঘটনাচক্র, এই তিন জিনিষের হাত থেকে সুবিচারকে ছিনিয়ে আনতে হয়।

লাচির চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করলো। এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আপন মনে বলে উঠলো ঃ

'আমি ছিনিয়ে নেবো। আমি আদায় করে নেবো।'

সে হাতের পিঠ দিয়ে অশ্রু মুছে নিলো এবং মাটিতে শুয়ে পড়লো।

হঠাৎ তাঁবুর পেছন থেকে এমন শব্দ আসতে লাগলো যেন কেউ

তাঁবুর পর্দার উপর মুঠিভর্তি বালি ছুঁড়ে মারছে।

লাচি উঠে বসলো।

বেশ কিছুক্ষণ বসে বসে শব্দটা শুনতে থাকলো।

পরে তার কাছে মনে হলো যেন কেউ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

যেন কেউ মৃদুস্বরে ডাকছে 'লাচি—!'

তৎক্ষণাৎ তাঁবুর পেছন থেকে বেরিয়ে এলো লাচি।

বাইরে গুল দাঁড়িয়ে আছে।

গুল বেলুচির ছেলে। বেলুচিকে এখানকার সবাই চেনে। কেননা বেলুচি রেলওয়ের কর্মচারী এবং তার আশেপাশের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের সুদে টাকা ধার দেয়। গুল সেই বেলুচিরই ছেলে। কিন্তু বাপ আর ছেলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। লাচি গুলকে প্রায়শঃ রেলষ্টেশনে এবং রেলওয়ের বিভিন্ন কোয়ার্টারে যাওয়া-আসা করতেও দেখেছে। উচ্চতায় গুল বাবার মতোই লম্বা, প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি। কিন্তু বাবার মতো চওড়া ভরাট শরীরের নয়, বরং পাতলা ছিপছিপে একহারা শরীর গুলের।

বেলুচির ভ্রূ জোড়া খুব ঘন, গোঁফজোড়াও বেশ বড় আর গোল করে ছাটা। কিন্তু গুল ক্লিন শেভ্‌ড। বেলুচি প্রাচীনপন্থীদের মতো টুপী, লুঙ্গি এবং সেলোয়ার কামিজ পরে। আর গুল প্যান্ট-সার্ট পরে। বেলুচির চোখজোড়া খুব বড় আর ভীতিপ্রদ। যখন সে চোখজোড়া রক্তের মতো লাল করে পাওনাদারদের শাসায়—তুমি সুদের টাকা কেন নিয়ে এলে না?—তখন ওরা ভয়ের চোটে থর থর করে কাঁপে। গুলের চোখও বড় বড়, তবে সব সময় ওই চোখজোড়া কেবল স্বপ্নে বিভোর থাকে যেন। আর বেলুচি প্রায় সময় বলে বেড়ায়ঃ

'এ সব পার্থক্য স্রেফ এ জন্য যে, ছেলেকে আমি ভুলে এফ. এ. পর্যন্ত পড়িয়েছি। পড়ালেখা শিখে ছেলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ছেলেটা আর কোন কাজের না।'

কিন্তু গুল বাবার অনেক কাজ করে। তার মিষ্টি কথা আর অমায়িক ব্যবহারে খুশী হয়ে সবাই বাবার পরিবর্তে ছেলের সঙ্গে ব্যবসা করতে পছন্দ করে।

রহস্যটা বেলুচি জেনে গেছে। এ কারণেই টাকা আদায় করার জন্য প্রায় সময় বেলুচি ছেলেকেই পাঠায়। কিন্তু টাকা আদায় করার ব্যাপারে সব সময় সাবধান থাকে সে। এক একটা পাই পয়সার হিসাব পর্যন্ত ছেলের কাছ থেকে নিয়ে নেয় বেলুচি। আর যদি ছেলে চার-ছ' টাকা সুদ হিসাবে ছেড়ে দেয় তো তা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝগড়া বাঁধে বাপ-ছেলেতে। বেশ রাগারাগি হয়। মাথায় খুন চেপে গেলে গুলকে গালিগালাজও করে। আর গুলও সুবোধ ছেলের মতো সবকিছু সহ্য করে নেয়।

এ সময় প্রায় অর্ধেক রাতে গুলকে নিজের সামনে দেখে লাচি বড় আশ্চর্য হলো, বললো ঃ

'তুমি বেলুচির ছেলে না ?'

'হ্যাঁ, আমি গুল।'

'আমার বাবা-মা'কে কি কোন টাকা-টুকা ধার দেবার আছে ?'

'না।'

'তাহলে কেন এসেছো ?'

গুল চুপ করে থাকলো।

'বলো—!'

লাচি তীক্ষ্ণস্বরে বললো।

গুল বললো ঃ

'তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'বলো—!'

'এখানে না।'

'তাহলে কোথায় ?'

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

গুল ঘাড় ফিরিয়ে রেলওয়ের একটা পুরনো ব্রীজের দিকে তাকালো। ষ্টেশন ইয়ার্ডের আউটার সিগন্যালের একেবারে নিকটে রঙচটা একটা পুরনো ব্রীজ আছে, যেটা এখন আর ব্যবহৃত হয় না।

কোন এক কালে, যখন ইয়ার্ডটা ছোট ছিলা এবং ষ্টেশনটাও ছিলো অখ্যাত, তখন এই ব্রীজটা হয়তো ব্যবহৃত হতো। কিন্তু

এখন—এখন তো ব্রীজটার দু'দিকেই ইয়ার্ড বিস্তার লাভ করেছে। ব্রীজটার নীচে দিয়ে এখন স্রেফ দুটো লাইন চলে গেছে। ইয়ার্ডের প্রায় ডজনের মতো ছড়িয়ে-থাকা ইস্পাতের চকচকে লাইনের উপর পুরনো অকেজো, অনেকটা পেনসনভোগী কর্মচারীর মতো ব্রীজটা এখনো মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেক আগেই রেলওয়ের একজন বড়কর্তা ব্রীজটা খুলে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যেন মানুষ ব্রীজটার অস্তিত্বই ভুলে গেছে। এ জন্যই তো ব্রীজটা এখনো ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। না মৃত, না জীবিত। ওর রঙচটা বিবর্ণ অসহায়তার উপরও এখন আর কারো দয়া হয় না।

গুল বললো ঃ

'ব্রীজের উপর যাবে?'

'ব্রীজের উপর কেন?' লাচি বললো, 'এখানে বলো না।'

'আমার সাথে যেতে ভয় পাও?' গুল জিজ্ঞেস করলো।

'ভয়তো আমি আমার বাবাকেও পাই না, তোমাকে কি পাবো!'

-বলেই লাচি গুলের সাথে রওনা দিলো।

তাঁবুর পেছন দিয়ে ওরা রেলওয়ের লোহা লক্কড়ের জঞ্জাল টপকে ইয়ার্ডের ভেতর চলে গেলো। তারপর সামান্য কিছুক্ষণ পর পুরনো ব্রীজের সিঁড়িতে গিয়ে পৌঁছলো।

'একটু সাবধানে হাঁটো!' গুল লাচির একখানা হাত ধরতে ধরতে বললো, 'মাঝে মাঝে সিঁড়ি নেই কিন্তু।'

'সেই অজুহাতে আমার হাত ধরো না বলছি।'

লাচি গুলের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বললো ঃ

'আমারও চোখ আছে। আমিও দেখতে পাই। তুমি আগে আগে হাঁটো, আমি তোমার পিছনে পিছনে আসছি।'

গুল তাড়াতাড়ি লাচির হাত ছেড়ে দিলো। এবং আগে আগে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর ওরা দু'জন ব্রীজের উপর গিয়ে পৌঁছলো। এখান থেকে ষ্টেশন ইয়ার্ড, তার লাল সবুজ বাতি, অনেকদূর অবধি চক

চক করতে থাকা ইস্পাতের রেললাইন দু'টি সুরমার ধারার মতো একটা আরেকটাকে কেটে সুদূর প্রান্তরে হারিয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। এ দিকে রেলওয়ে ষ্টেশন নীরব, নিঝুম। ওদিকে যাযাবরদের তাঁবুর উপরে গুলমোহর গাছের শন্ শন্ করতে-থাকা নগ্ন ডাল-পাতা মাথা উঁচিয়ে যেন প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসন্তকালের প্রতীক্ষায়।

গুল বললো ঃ

'এসব নগ্ন ডাল-পাতায় কবে ফুল ফুটবে?'

'আরে বেলুচির বাচ্চা!' লাচি গর্বোদ্ধত ভঙ্গীতে বললো, 'আমার সাথে তোমার কি কাজ? সাফ সাফ বলো। ফুলের কথা বলে আমাকে ফাঁকি দিও না। দৈনিক হাজার বার এ জাতীয় কথাবার্তা শুনে আসছি আমি—

তুমি আমার হৃদয়ের ফুল!

তুমি আমার মনের রাণী।

তুমি আমার প্রাণপ্রিয়। এবং এসব কথা যদি না শুনি, তাহলে আমি জাত হারামজাদী, কুত্তি, বেশ্যা, আওয়ারা। হ্যাঁ, কি বুঝলে! তোমার বাবার কোন কর্জ শোধ করার নেই আমার।'

গুল ব্রীজের পুরনো শক্ত জংধরা লোহার রেলিংয়ে ভর দিয়ে মৃদুস্বরে বললো ঃ

'আমি এখানে প্রতিদিন আসি। ঠিক এ সময়, রাত দু'টোয় যখন কেউ থাকে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকি।'

লাচি হেসে বললো ঃ

'এতোক্ষণে আসল কথা বুঝতে পারলাম।'

গুল বললো ঃ

'ব্রীজটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে, কারণ এই ব্রীজ কোথাও যায় না।'

লাচি জিজ্ঞেস করলো ঃ

'কোথাও যায় না মানে? অন্যান্য ব্রীজগুলো কি যায়? সব ব্রীজই তো এক জায়গায় পড়ে থাকে।'

গুল বললো ঃ

'হ্যাঁ! কিন্তু অন্যান্য ব্রীজের যাত্রীরা তো কোথাও না কোথাও যায়। অন্যান্য ব্রীজ একজনের সাথে আরেক জনের মিলন ঘটায়। কিন্তু এই ব্রীজ কারো সাথে কারো মিলন ঘটায় না, না কোন সড়কের সাথে কোন সড়কের মিলন ঘটায়, না কোন শহরের সাথে কোন শহরের। না কোন ঘরের সাথে কোন ঘরের, না কোন মানুষের সাথে কোন মানুষের।'

অনেকদূর থেকে ঝিক্ ঝিক্ আওয়াজ তুলে একটা মালগাড়ী এগিয়ে আসছিলো। এখন গাড়ীটি এতো কাছে চলে এসেছে যে তার কালো ইঞ্জিনকে দেখতে মনে হচ্ছিলো যেন একটি ভয়ানক দৈত্য। কিছুক্ষণ পর গাড়ীটি বিকট গর্জন করতে করতে ব্রীজের নীচ দিয়ে অতিক্রম করতে থাকলে পুরনো ব্রীজটা জোরে জোরে নড়ে উঠলো। এবং তার প্রতিটি সংযোগ যেন আর্তনাদ করে উঠলো। এক সময় ব্রীজটি এমন জোরে নড়ে উঠলো যে, লাচি একটা ভয়ার্ত চিৎকার মেরে গুলের বুকের সাথে লেপ্টে গেলো।

কিছুক্ষণ পর গাড়ীটি চলে গেলো।

ব্রীজটিও আবার নীরব হয়ে গেলো।

লাচিও গুলের কাছ থেকে সরে গেলো। কিন্তু গুলের হাত খুব ধীরে ধীরে লাচির হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো।

গুল হেসে বললো ঃ

'আমার অনুমান ভুল নয়। আমার ধারণা ছিলো, তুমিও একজন নারী।'

লাচি অবজ্ঞাভরে গুলের দিকে তাকালো। এবং বললো ঃ

'এরপর বল না, আমি খুব সুন্দরী, খু-উ-ব সুন্দরী, তুমি আমার উপর জান দিতে পারো, এবং আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। তুমি ছাড়া আর এ জীবনে আছে কি! খোদার ওয়াস্তে কথাগুলো তাড়াতাড়ি বলে ফেলো, যেগুলো শুনাবার জন্য আমাকে এই ব্রীজের উপর নিয়ে এসেছো!'

গুল চুপ করে থাকলো।

তার বড় বড় একজোড়া চোখে অশ্রু টলোমলো হলো। কিন্তু বড় সাহসিকতার সঙ্গে অশ্রু চোখেই শুকিয়ে নিলো। এক ফোঁটা অশ্রুও নীচে গড়িয়ে পড়তে দিলো না।

তারপর আস্তে করে বললো ঃ

'আমি তোমাকে এই ব্রীজটা দেখাতে এনেছিলাম। ব্রীজটা কোথাও যায় না, ঠিক আমার আশা-আকাঙ্ক্ষারই মতো।

'লেখাপড়া জানা লোক তো তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলো। কিন্তু সব কথার ওই এক অর্থ। আর সবার মতো তুমিও আমার ইজ্জত লুটতে চাও, তা চাইবে না কেন? আমি যে একজন যাযাবর মেয়ে।'

গুল নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলো মাত্র। কিছু বললো না। স্রেফ লাচিকে দেখতে থাকলো।

লাচি বললো ঃ

'চলো এবার, প্রেম হয়ে গেছে। আমাকে তাঁবু পর্যন্ত দিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, এই প্রেম খেলার জন্য আমাকে কত দেবে তা তো বললে না?'

দ্রুত লাচির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো গুল। একখানি হাত লাচিকে মারার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো সে। এবং লাচির দিকে পিঠ করে দ্রুত পুরনো ব্রীজের সিঁড়ি ভেঙ্গে চলে গেলো। সে দ্রুত ব্রীজের সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে বাড়ীর দিকে চলে যাচ্ছে।

লাচি ওখানে ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকলো আর জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

গুল অদৃশ্য হয়ে গেলে লাচি ধীরে ধীরে ব্রীজ থেকে নীচে নেমে এলো। এবং নিজের ক্ষীণ কোমর দোলাতে দোলাতে তাঁবুর দিকে চলে গেলো।

পরদিন লাচি রাসীর সাথে পরামর্শ করলো। রাসীর বয়েস ত্রিশ বছরের উপর হবে। তার রূপ যৌবন ধীরে ধীরে বুঁজে আসছে। রূপ যৌবন সে প্রতিদিন লাল লাল প্রসাধন মেখেই জালিয়ে রেখেছে। যাযাবর মেয়েদের মধ্যে রাসী সবচেয়ে বুদ্ধিমতী আর অভিজ্ঞ। তার গাহাকরাও আর সবার তুলনায় পয়সাঅলা আমীর। এ জন্য তার কাপড়-চোপড়ও সবার চেয়ে অনেক মূল্যবান। তার স্বামী জুমরা দিনরাত মদ খায়। রাসীর আয়ের বেশীর ভাগ অংশ সে মদ আর জুয়োর পেছনে ব্যয় করে। এবং রাসীকে মাসে দু'চারবার পিটুনি দেয়। রাসীও ভাগ্যবতী নারীর মতো সে মার সহ্য করে। কারণ তার বিশ্বাস, বউকে পিটানোর অধিকার সব স্বামীরাই অর্জন করে নেয়। এ জন্যই মার খেতে এখন তার কাছে বেশ ভালো লাগে। বরং বেশীদিন হয়ে গেলে মার খাবার জন্য তার গায়ের চামড়াটাও বড় অস্থির হয়ে পড়ে। সারা শরীর কেমন যেন চুলকায়। তখন একটা অজুহাত খুঁজে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে বসে। তার পর পিটুনি খেয়ে স্বামীর পা টিপতে শুরু করে। রাসী স্বামীকে খুব ভালোবাসে। ভালোবাসা তো তার গাহাকদের সঙ্গেও হয়ে যায়। তবে সে ভালোবাসা স্রেফ কয়েক মুহূর্তের ভালোবাসা। আর স্বামী স্বামীই, তেমনি গাহাক গাহাকই। দোকান থেকে তো যে কেউ মাল খরিদ করতে পারে, কিন্তু দোকানের মালিক তো স্রেফ একজনই।

রাসী খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। জীবনের সঙ্গে বড় সুন্দরভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে। আসল কথা পৃথিবীটাই এদের মতো বুদ্ধিমান ছেলে-মেয়েদের উপর টিকে আছে। তা না হলে কবেই শেষ হয়ে যেতো। এ কারণেই রাসীর সাথে পরামর্শ করাটা একান্ত প্রয়োজন মনে করলো লাচি।

রাসী সবকথা শুনে বললো:

'সাড়ে তিনশ' টাকা? সাড়ে তিনশ' টাকা কি একটা টাকা হলো তোর কাছে? তুই হ্যাঁ কর, আমি এক্ষুণি তোর জন্য সাড়ে তিনশ'র গাহাক এনে হাজির করছি।'

'কিন্তু গাহাক চাই না।'

'গাহাক ছাড়া সাড়ে তিনশ' টাকা পাবি কোথায়?' রাসী অবাক হয়ে বললো, 'টাকাও চাইবি, ধান্ধাও করবি না। তা কি করে হয়?'

'যদি না হয় তাহলে আমার কিছু চাওয়ার নেই।'

লাচি রেগে-মেগে রাসীর কাছ থেকে ফিরে এলো। আর রাসী অনেকক্ষণ ধরে লাচির গমন পথের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলো। পরে আপন মনে হেসে উঠলো।

'কেমন পাগল মেয়ে, বুদ্ধি-শুদ্ধি ওর জীবনেও হবে না।'

তারপর একরাশ চশমা উলট পালট করে কি যেন খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলো।

এ সময় এক বাবু এসে দাঁড়ালো রাসীর মাথার কাছে। রাসী চোখ তুলে তাকালো এবং হেসে দিলো।

'বাবু চশমা লাগবে?'

বাবু বললো ঃ

'চশমা তো আমার চোখেই আছে।'

'তাহলে কি চাই? আংটি, পাথর, যেটা নিতে চান নিয়ে নিন।'

রাসী হেসে বললো।

'আমি একটা মোতি চাই।'

বাবু চোখ টিপে ওকে বললো।

রাসীর কাছ থেকে সরে এসে লাচি মাধুর দোকানে এলো এবং ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুলে নিয়ে খেতে লাগলো। মাধু একটু হাসলো মাত্র। কারন তখন তার দোকানে দু'তিনজন গাহাক দাঁড়িয়ে ছিলো। মাধু ওদের কাছে ফল বিক্রি করছিলো।

গাহাক চলে যেতে যেতে লাচি আপেলটার চারভাগের তিনভাগ খেয়ে ফেলেছে। মাধু ঝুড়ি থেকে আর একটা আপেল তুলে নিলো এবং লাচিকে দিলো।

লাচি প্রথম আপেলটা নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে মাধুর দেয়া ফলটা খেতে লাগলো।

আপেল খেতে খেতে বললো, 'মাধু তুমি আমাকে খুব ভালো-বাসো তাই না?'

জবাবে মাধু খিল খিল করে হেসে উঠলো। পরে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেললো।

মাধুর এই অঙ্গভঙ্গী লাচির খুব ভালো লাগলো। সে বললো, 'বলো মাধু, তুমি আমাকে কেমন পছন্দ করো?'

মাধু ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললো, 'আমার রুজি রোজগারের চেয়েও বেশী, আমার দোকানপাটের চেয়েও বেশী, আমার মুখের অন্নের চেয়েও বেশী।'

'আমি যা বলবো তা করবে?' লাচি বললো।

মাধুর মনে সাহস বেড়ে গেলো। সে চট করে বলে উঠলো, 'তুমি বললে আমি এ দোকান ছেড়ে দেবো, সব ফলমূল নর্দমায় ফেলে দেবো। তুমি বললে গাড়ীর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বো, তুমি বললে.....'

'ব্যাস—ব্যাস।' লাচি কথা কেটে বলে উঠলো, 'আমি চাই, তুমি যেখান থেকেই হোক আমার জন্য স্রেফ সাড়ে তিনশ টাকার ব্যবস্থা করো।'

'সাড়ে তিনশ?' মাধু দমে গেলো, 'সাড়ে তিনশ আমি কোত্থেকে দেবো। আমার তো পুঁজিপাট্টা বলতে এই ষাট-সত্তরটা ফল। ঘরে পঞ্চাশ-ষাট টাকা থাকতে পারে হয়তো।'

'কোত্থেকে দেবে তা আমি জানি না, তবে দিতে হবে। তা না হলে জীবনে আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।'

লাচি কপট রাগের ভঙ্গীতে বললো।

'না না!' মাধু অসহায় ভাবে বললো, 'লাচি এভাবে রাগ করিস না। আমার দিকে তাকা, ব্যাস এক নজর.....দেখ।'

'আচ্ছা দেখছি।'

লাচি ডাগর ডাগর চোখ জোড়া তুলে ধরলো মাধুর দিকে। আর মাধুর হৃদয়ে মনে হলো যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। এক মুহূর্তের

জন্য সে গলে পানি হয়ে গেলো যেন। মৃদুস্বরে বললো, 'দেখ, আজ সন্ধ্যার দিকে আসবি। আমি যেখান থেকে হোক একটা ব্যবস্থা করবো।'

'আচ্ছা!' বলেই লাচি মাধুর দোকান থেকে চলে এলো। ওর মাথা থেকে বোঝা নেমে গেছে মনে হলো।

সেদিনই লাচি আবারো ইয়ার্ড থেকে সরকারী কয়লা চুরি করলো। এবং সে কয়লা হালওয়াইর কাছে বিক্রি করে দেড় টাকা পেলো। অথচ এই দেড় টাকা রোজগার করার জন্য তাকে ইয়ার্ডে তিনবার চক্কর লাগাতে হয়েছে।

এরপর রেলওয়ের কোয়ার্টারগুলোর আশেপাশে বেশ কয়েকবার চক্কর লাগালো লাচি। শেষে টিকেট চেকার আলী ভাইর কোয়ার্টারের পেছন থেকে একটা মোটা-সোটা মুরগী চুরি করতে সমর্থ হলো।

তার ধারণা ছিলো মুরগীটা বিক্রি করে তিন সাড়ে তিন টাকা নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু কসাই রাজী হলো না।

'এটা হারামের মাল।'

'কিন্তু ঘরের পালা মোরগ এটা। সাড়ে তিন টাকার কমে দেবো না আমি।'

'আমি দেড় টাকার বেশী দেবো না।'

'দেড় টাকায় কিনে তুমি ওটা পাঁচ টাকায় বিক্রি করবে। একটু তো দয়া করো, আমি একজন গরীব যাযাবর মেয়ে।'

'আমিও গরীব কসাই মানুষ!'

'আমাকে সাড়ে তিনশ টাকার কর্জ শোধ করতে হবে।'

'আমার পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চা আছে, তিনটা বউ আছে।'

'চতুর্থ বউয়ের কথা কবে ভাবছো?'

লাচি ঠাট্টা করে বললো।

'যখন তুমি হ্যাঁ বলবে।'

লাচি গম্ভীর হয়ে গেলো। বললো, 'আচ্ছা দাও, তিন টাকাই দিয়ে দাও।'

'পৌনে দু'টাকা।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আড়াই টাকাই দাও।'

'দু'টাকা নিলে নাও, তা না হলে এগুলোও হারাবে। ওদিকে দেখো।'

সামনে তাকিয়ে দেখলো। একজন পুলিশ এদিকে আসছে। লাচি ভয় পেয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি মোরগটা কসাইর হাওলা করে দিয়ে সে দু'টাকা নিয়ে একদিকে সরে পড়লো। এখন তার পকেটে সাড়ে তিন টাকা আছে।

কিন্তু এভাবে কি আর হবে! কয়েক মুহূর্তের জন্য গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো লাচি। তখন এক সময় তার মাধুর প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেলো। এবার লাচির মনে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলো। এবং সে কসাইর ওখান থেকে রাস্তায় নেমে পুরো বাজার চক্কর লাগাতে লাগাতে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলো। এখন সে ভিক্ষা করবে।

বাস ষ্ট্যাণ্ডে স্রেফ দু'জন জেলেনী দাঁড়িয়ে আছে। বাজারে মাছ বিক্রি করে এসেছে। এখন খালি টুকরী নিয়ে পরস্পর খোশ গল্পে মেতে উঠেছে। আর কেবল হাসছে। লাচি কিছু চাওয়ার নিমিত্তে একখানা হাত সামনে বাড়িয়ে দিলে, ওদের মধ্য থেকে একজন ধমক দিয়ে বললো, 'লজ্জা করে না ধুমসি মাগী, এভাবে মাংসের ডেলা নিয়ে ভিক্ষা করতে! যা ঘর-দোর কর গিয়ে।'

'তোর ঘরে গিয়ে উঠবো?'

লাচি চমকে উঠে জবাব দিলো।

জেলেনী ওকে মারার জন্য ছুটে এলো। লাচি হাসতে হাসতে পালিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর জেলেনী দু'জন একটি বাসে উঠে চলে গেলে বাস ষ্ট্যাণ্ড আবারো ফাঁকা হয়ে যায়। লাচি আবার বাস ষ্ট্যাণ্ডে ফিরে এলো। এখন শুধু ধনিয়া ভিখারিণী অন্ধ বুড়িটি একা দাঁড়িয়ে ফাঁকা বাস ষ্ট্যাণ্ডে ভিক্ষা করছে।

'লাচি তাকে বুঝালো, 'ষ্ট্যাণ্ড তো খালি, তুমি কার কাছে ভিক্ষা চাইছো?'

'তুমি কে?'

ধনিয়া ভিখারিণী কড়কড়ে গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'আমিও তোমার মতোই একজন ভিখিরী।'

এ কথা বলেই লাচি জোরে হেসে উঠলো।

'হ্যায় হ্যায়, জোয়ান হাসি তোর!'

ধনিয়া রাগ করে বললো, 'তোর উপর গজব পড়ুক, কেন গরীব ভিখিরীর রুজি রোজগার বরবাদ করতে এলি?'

'আমি কিছু বলেছি তোমাকে?'

লাচি আশ্চর্য হয়ে বললো।

'তুই থাকতে আমাকে কে আর ভিক্ষা দেবে?' ধনিয়া বিমর্ষভাবে বললো, 'কেমন দিনকাল এলো, ভিক্ষা দিতে গিয়েও মানুষ সুন্দর শরীর দেখে, জোয়ান শরীর দেখে। আমার মতো গরীব অন্ধ বুড়িকে কেউ জিজ্ঞেসও করে না।'

তা ঠিক তিন চার ঘণ্টার মধ্যে লাচি আড়াই টাকার মতো পেয়েছে ভিক্ষা করে। কিন্তু অন্ধ বুড়ি ধনিয়ার কাছে বড় জোর দশ পয়সা জমা হয়েছে কিনা বলা মুশকিল। তাও স্রেফ মহিলারাই দয়া পরবশ হয়ে দিয়েছে। লাচি মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলো। কোন যুবক পুরুষ তাকে একটা পয়সাও দেয়নি। সবাই লাচিকে লালসার দৃষ্টিতে শুধু দেখছে আর পয়সা দিচ্ছে।

লাচির মনটা একরাশ আনন্দে ভরে গেলো। ঘুরে সামনের পানের দোকানে চলে গেলো সে। এবং দু'পয়সার পান খেয়ে সামনের আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পানের দোকানের সামনে মানুষের ভাড় লেগে গেলো।

'দু'পয়সার ঘোড়া মার্কা বিড়ি দাও।'

'এক আনার সুলতান বিড়ি।'

'দেশী সাদা।'.....

লাচি ঘাগরার পকেট থেকে দু'পয়সা বের করে পানঅলাকে

দিতে চাইলো।

পানঅলা স্মিত হেসে মাথা নাড়লো। বললো, 'যানি, ব্যাস মাঝে মধ্যে আমার দোকানের সামনে মিনিট দু'মিনিট দাঁড়িয়ে যাস্। আমার পানের পয়সা ওতেই আদায় হয়ে যাবে।'

'হুঁ, শূয়রের গোষ্ঠী।'

লাচি গালি ছুঁড়ে মারলো পানঅলাকে। তারপর জোরে নর্দমায় পানের পিক ফেলে নিজের ছিট কাপড়ের ঘাগরা দোলাতে দোলাতে মাধুর দোকানের দিকে রওনা দিলো। কারণ সন্ধ্যা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

মাধু দোকান বন্ধ করছিলো। এ সময় লাচি এসে পৌঁছলো। পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাধুর দোকান বন্ধ করা দেখতে থাকলো সে। মাধু তো এতো সকাল সকাল কখনো দোকান বন্ধ করে না। বরং রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটায়, পুলিশ রাউণ্ডে আসার আগে সে দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আজ তার কি হলো!

এ সময় লাচির খেয়াল হলো, এই হতভাগা বোধহয় আমি আসার আগেই দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যেতে চাইছে। পালাবার আগেই যে ধরে ফেললাম ভালোই হলো।

লাচি ওখানেই, মাধুর পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো।

মাধু দোকান বন্ধ করে চাবির গোছা পকেটে পুরে ঘাড় ফেরাতেই দেখলো লাচি তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সে চমকে উঠলো। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলো যেন।

লাচি বললো, 'পালাচ্ছিলে কেন রে মাধু?'

'না!' মাধু অস্বীকার করতে করতে বললো, 'আমি তো দোকান বন্ধ করছিলাম। দোকান বন্ধ করে তোর পথ চেয়ে থাকতাম।'

'পয়সা এনেছিস?'

'স্-স্, আস্তে বল।' মাধু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, 'কেউ

শুনে ফেলবে।'

'শুনলে কি হবে?'

লাচি নির্ভয়ে বললো।

'তুই কিছুই বুঝিস না। এদিকে আয়, ট্যাক্সীতে বস। সব বলছি।'

লাচি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, কিছুদূরে একখানি ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে আছে। লাচি মাধুর সঙ্গে ট্যাক্সীতে গিয়ে বসে পড়লো।

ড্রাইভার ট্যাক্সী ঘুরিয়ে ষ্টেশনের বাইরে নিয়ে গেলো। এবং রাস্তার এক পাশে ট্যাক্সী থামালো। জায়গাটুকু ঘন পত্রপল্লবাচ্ছাদিত। পাশেই রয়েছে একটি পাবলিক টেলিফোন বুথ।

এখানে ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে মাধু পকেট থেকে নোট বের করলো এবং লাচির হাতে গুঁজে দিয়ে বললো, 'বড় কষ্টে একশ টাকা যোগাড় করেছি, গুণে দেখ।'

দশ টাকা, পাঁচ টাকা, দু'টাকার নোট। ময়লা, দুমড়ানো, ঘামে ভেজা, দুর্গন্ধে ভরা। কিছু খুচরো পয়সাও ছিলো—আধুলি, সিকি, দু'আনি, এক আনি।

'কিন্তু—!' লাচি টাকা গুণে বললো, 'এতো মাত্র একশ টাকা!'

'এটাই আমার সারা জীবনের সঞ্চয়।' মাধু অনেকটা বিমর্ষভাবে বললো, 'তোর হাতে সোপর্দ করলাম, রেখে দে।'

লাচি টাকা নিয়ে নিলো।

মাধুর লোভাতুর বিবর্ণ ঠোঁটে পাতলা শ্লেষ্মা চিক চিক করে উঠলো। মাথায় ঘাম দেখা দিলো। সে আস্তে আস্তে হাতখানা বাড়িয়ে দিলো এবং তার কম্পিত আঙ্গুল লাচির হাত স্পর্শ করতে লাগলো। তারপর আস্তে করে লাচিকে বললো, 'এখন কোথাও যাওয়া দরকার।'

'কোথায় যাবো?' লাচি জিজ্ঞেস করলো।

'যেখানেই হোক, বেড়িয়ে আসা দরকার।' মাধু কম্পিতস্বরে বললো। এবং তার অস্থির আঙ্গুলগুলোও লাচির আঙ্গুলকে কি যেন বলতে লাগলো।

হঠাৎ লাচির শরীরের সমস্ত লোমকূপ দাঁড়িয়ে গেলো। তার

কাছে মনে হলো যেন একটা কেঁচো কিম্বা নোংরা ময়লা নর্দমার কিল বিল করা কোন বিশ্রী পোকা তার শরীরের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে টাকার নোটগুলো মাধুর মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো এবং খুব দ্রুত ট্যাক্সীর দরোজা খুলে নেমে গেলো। তার চোখের গভীর সবুজ একজোড়া ঝিলে রাগ ঢেউ খেলে গেলো।

'কমিনা, কুত্তা!' লাচি একখানা পাথর তুলে নিলো।

'ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ী ষ্টার্ট করে মাধুকে নিয়ে পালিয়ে গেলো। পাথর একটার পর একটা গাড়ীর মাডগার্ড ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলো।

'ভাগ্যিস ট্যাক্সীর কোন আয়না ভাঙ্গেনি', ড্রাইভার বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালো, 'তা না হলে ওরে বাপস্, লাচির রাগ থেকে খোদা রক্ষা করুক। রাগের সময় এমনিতে মানুষের ভুল হয়ে যায়।'

লাচি চতুর্থ পাথরটা তুলে নিয়েছিলো। কিন্তু ততক্ষণে ট্যাক্সী হাওয়া। পাথর তার হাতেই রয়ে গেলো। মুহূর্তের জন্য পাথরটার দিকে তাকালো লাচি, পরে শূন্য রাস্তার দিকে। পাথরটা জোরে ছুঁড়ে মারলো এবং অসহায়ভাবে কাঁদতে লাগলো। বড় রাগ হলো তার। সে মাধুকে ভেবেছিলো কি, আর হলো কি!

পাবলিক টেলিফোন বুথের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মুহূর্তের জন্য লাচি ভাবলো, ভেতরে ঢুকে খোদার কাছে ফোন করি না কেন? তার কাছ থেকে সাড়ে তিনশ টাকা চেয়ে নিই! এই ফোন কি খোদা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে না? পৌঁছবে না? খোদা কেন তাকে কোথাও থেকে সাড়ে তিনশ টাকা এনে দেয় না? খুব বেশী টাকা তো নয়! তা এই পৃথিবীতে কেউ তার ইজ্জত না নিয়ে কেন সাড়ে তিনশ টাকা দিতে চায় না?

'ডার্লিং! কাকে ফোন করার জন্য এখানে দাঁড়ালে? এসো, আমার গাড়ীতে এসে বসো।'

লাচি পেছন ঘুরে দেখলো খুব সুন্দর আকাশী রঙের পোষাকে আবৃত সুদেহী এক যুবক গাড়ী চালাচ্ছে আর তার দিকে তাকিয়ে

হাসতে হাসতে বলছে।

লাচি একটা পাথর তুলে নিলো।

গাড়ী পেট্রোলের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পালিয়ে গেলো।

সন্ধ্যায় লাচি যখন টিলা ঘুরে আপন তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিলো তখন তার বাবা প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিলো।

লাচি বাবার দিকে গভীরভাবে তাকালো। পরে ঘুরে চলে যেতে লাগলো।

রেগি সামনে এসে লাচির পথরোধ করে দাঁড়ালো। এবং তার হাত ধরে বলতে লাগলো, 'কোথায় যাচ্ছিস, আমার পয়সা দিয়ে যা।'

লাচি বিদ্যুতের মতো দুমড়ে-মুচড়ে হাত ছাড়িয়ে নিলো। এবং উল্টো হাতে এমন জোরে কষে এক থাপ্পড় মারলো যে, রেগির ঠোঁট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

রেগি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পরে ঠোঁটের রক্ত মুছে নিয়ে নিজের হাতের তালুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। যেখানে একেবারে তরতাজা লাল রক্তের একটা রেখা অঙ্কিত হয়ে তালুর এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে।

লাচি বললো, 'তুমি যদি আমার বাবা হও, তাহলে দুমারুর টাকা শোধ করার আগে তুমি আমার কাছ থেকে আর এক পয়সাও চাইবে না।'

রেগি নিজের রক্তের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'সাড়ে তিনশ টাকা তুমি একা কি করে শোধ করবে?'

'তুমি শুধু দেখে যাও।' লাচি সিদ্ধান্তমূলক ভঙ্গীতে বললো।

'তোমার দেহটা নারীর, কিন্তু মনটা পুরুষের। ব্যাস, কথাটা ভাবলেই মনটা দুঃখে ভরে যায়।'

'কেন?' লাচি থেমে জিজ্ঞেস করলো।

রেগি বললো, 'জীবনটা বড় ছোট। রূপ-যৌবন তার চেয়েও ছোট। এজন্যে আমার বাবা প্রায়ই বলতেন, গাও, বাজাও, আমোদফুর্তি করো, যতদূর সম্ভব কাজ না করে কাটিয়ে দাও। আর সব সময় ঘোরো ফিরো। এক জায়গায় গেড়ে বসলে মানুষ গাছের পাতার মতো একদিন হঠাৎ ছিঁড়ে যায়, এবং পতন ঘটে।'

রেগি ময়লা আস্তিন দিয়ে রক্ত মুছে ফেললো।

লাচি বললো, 'আমি তাঁবু চাই না, ঘর চাই।'

মনের গভীর থেকে একরাশ হাহাকার, অস্থিরতা আর বিমর্ষতা নিয়ে এলো শব্দ ক'টা। আবেগের আতিশয্যে সে নিজেও ঘাবড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে গেলো।

রেগি ওকে দেখতে থাকলো।

দুমারু আপন তাঁবুর সামনে চাটাই বিছিয়ে মদ পান করছে। তার দু'বগলে রোশী আর জাঁমা।

লাচি গিয়েই ছ'টাকা বের করে তার হাতের তালুতে রাখলো।

দুমারু টাকা হাতে নিয়ে হাসতে লাগলো।

'এভাবে ক'বছরে কর্জ শোধ করবি?'

তোমার কাছে যে ক'বছরের প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে ক'বছরে শোধ করবো। তুমি চিন্তা করার কে?'

'তোমার ফুলের মতো শরীরের চিন্তা আমার হবে না তো কার হবে?'

দুমারু হাসলো।

তার সঙ্গের মেয়ে দু'টিও হাসলো।

লাচি চুপ থাকলো।

দুমারু গাছের সারির দিকে গভীরভাবে তাকালো। এবং তার নগ্ন ডাল-পালার দিকে। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে বললো, 'গাছগুলোও প্রতীক্ষায় অস্থির। আমার হৃদয়ের মতোই প্রতীক্ষা করছে ওরা।'

'বসন্ত এখনো বহুদূরে।'

লাচি দৃঢ় প্রত্যয়ে আঙ্গুল নেড়ে বললো। এবং ওখান থেকে চলে গেলো।

দুমারুর হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠলো।

লাচির এমন উদ্ধত চাল-চলন দেখে রোশী আর জাঁমার মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো।

জাঁমা দাঁতে দাঁত পিষে বললো, 'খানকি মাগী, নিজেকে এখন সতী বলে জাহির করছে।'

দুমারু ধীরে ধীরে এক চুমুক পান করতে করতে বললো, 'একটু দাঁড়াও, তোমরা শুধু দেখে যাও কি হয়।'

আজ লাচির চোখে ঘুম নেই। তাঁবুর দেয়ালগুলো কারাপ্রাচীর হয়ে চারদিক থেকে তাকে চেপে ধরছে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। দূরের পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজলো, একটা বাজলো, দু'টো বাজলো কিন্তু তবুও ঘুম এলো না। তখন লাচি ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে পড়লো। উঠে বসলো। পরে তাঁবুর পেছন দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

বাইরে এসে লাচি পরিপূর্ণভাবে চোখ মেলে তাকালো। একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে নিলো। এ সময় দূরের ব্রীজের উপর তার দৃষ্টি গিয়ে স্থির হয়ে গেলো। ব্রীজের পেছনে আউটার সিগন্যালের সবুজ আর লাল বাতি জ্বলছে। ব্রীজের উপরে একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। এমন নিশ্চুপভাবে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন ব্রীজেরই একটা সিগন্যাল।

'গুল!'

লাচির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হঠাৎ কিসের একটা ঢেউ খেলে গেলো যেন। তার আপাদমস্তক কিসের এক তীব্র নেশায় কেঁপে কেঁপে উঠলো। এক অভূতপূর্ব বিজয়ের অনুভূতি তাকে পাগল করে তুললো।

প্রথম প্রথম তার মন চাইলো তাঁবুতে ফিরে যেতে। কিন্তু তার পা জোড়া কোন ক্রমেই পেছনের দিকে ফিরলো না। অগত্যা সে ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছায়াটাকে দেখতে থাকলো। ছায়াটা তখনো নীরব নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। পরে সে দ্রুত পা ফেলে

লাফাতে লাফাতে পুরনো ব্রীজের দিকে চলে গেলো।

'আমি জানতাম তুমি আসবেই।'

গুল মৃদুস্বরে কথাটা বললো। ততক্ষণে লাচি তার কাছে এসে ব্রীজের রেলিংয়ের উপর ঝুকে দাঁড়িয়েছে। যেরকম গুল সেদিন ঝুকে দাঁড়িয়েছিলো।

'উঁহু'—লাচি অস্বীকার করলো, 'তাঁবুর ভেতরে খুব গরম লাগছিলো, তাই চলে এলাম।'

গুল চুপ করে থাকলো।

তারা উভয়ে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়ে দিলো।

ইয়ার্ড সম্পূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ। দূরে একটি গাড়ী যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে শব্দ আস্তে আস্তে দূর দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে।

'শুনলাম, তোমার নাকি সাড়ে তিনশ টাকার খুব দরকার?'

'ছ' কম সাড়ে তিনশ।

গুল আবারো বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকলো।

'আমি তোমাকে কাল না হোক পরশু টাকা এনে দেবো।'

'কোথেকে?'

'আমার বাবা সুদে টাকা দেয়, তার কাছ থেকে চেয়ে নেবো।'

'কি বলবে?'

'মিথ্যা বলবো না, সত্যি কথাই বলবো।'

'সত্যি এনে দেবে?'

'কাল না হোক পরশু এনে দেবো।'

'পরশু কোথায় দেখা হবে?'

'এখানেই, এই ব্রীজের উপর।'

'কখন?'

'ঠিক এ সময়।'

'আর ট্যাক্সী দাঁড় করাবে কোথায়?'

গুল অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগলো। লাচির কথা বুঝতে পারেনি সে।

'কোন ট্যাক্সী?'

সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'সেই যে টাকা দেওয়ার পর যেটায় করে আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে!'

এবার গুল বুঝতে পারলো। মাথাটা ঝুকে পড়লো তার। এবং মুখ দিয়ে একটা আহা শব্দ বের হলো।

লাচি বড় তিক্তস্বরে বললো, 'আমার সামনে এসব আহা-টাহা বলো না। আমি যুবতী হবার পর থেকে সারাদিন কেবল আহা-ই শুনে আসছি। বাস ষ্ট্যাণ্ডে, ষ্টেশন ইয়ার্ডে, কসাইর দোকানে, অলিতে গলিতে, হাটে বাজারে, যেখানে যাই কেবল সবার মুখে আহা-ই শুনি। তুমি সেই কুত্তাগুলোকে দেখোনি, হাঁড় দেখলেই যাদের মুখ থেকে জিব বেরিয়ে পড়ে!'

'সব মানুষ এক নয়।'

'সব কুত্তাই এক।'

গুল জোরে লাচির বাহু চেপে ধরলো। তার চেহারা কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে। সে লাচির হাতে জোরে চাপ দিতে দিতে বললো, 'খোদার কসম, বড় নষ্টা মেয়ে তুই। অসভ্য, অজ্ঞ। আমি তোকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।'

'তাহলে এ ব্রীজে কেন এলে?'

লাচি বড়ই দুর্বল আর কোমলস্বরে বললো।

গুল কোন জবাব দিলো না। দ্রুত লাচির বাহু থেকে হাত সরিয়ে নিলো।

লাচি নিজের বাহুর দিকে তাকিয়ে গুলকে বললো, 'চোখে দেখো না, বাহুতে নখ বসিয়ে দিয়েছো, জংলী কোথাকার।'

আসলেও তাই, লাচির চন্দনের মতো বাহুতে নখ বসে যাবার দরুন লাল লাল দাগ পড়ে গেছে। রক্ত জমে গেছে। সে রক্ত দেখে গুল অস্থির হয়ে উঠলো। তার মন চাইলো লাচিকে নিজের দু'বাহুতে এমন ভাবে চেপে ধরতে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু লাচির দিকে এগুতে এগুতে সে হঠাৎ থেমে গেলো।

সে দু'হাতে নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলো। পরে কালকের মতো

মুখ ঘুরিয়ে কিছু না বলেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলো।

লাচি হাসলো।

প্রথমে আস্তে আস্তে হাসলো।

পরে জোরে জোরে হাসলো।

পরে একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

চলে যেতে যেতে গুলের কাছে মনে হলো যেন লাচি নিজের দেহ আর মনের অবজ্ঞা মিশ্রিত হাসি দিয়ে ওকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। সে আরো জোরে ছুটতে লাগলো। এবং লাফিয়ে রেল রাস্তার কাঠ পেরিয়ে ইয়ার্ডের অন্যদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। যে দিকে একটি মালগাড়ী অনেকদিন থেকে দাঁড়িয়ে আছে ঘাসের গাঁট নিয়ে যাবার জন্য।

হাসতে হাসতে হঠাৎ চুপ হয়ে গেলো লাচি।

তারপর নিজের রক্তাক্ত বাহুটা উপরে তুললো। গুলের নখের দাগ লাল হয়ে আছে। বাঁকা চাঁদের মতো এই চিহ্নটার গায়ে আশার রক্ত জমে আছে, যেটা লাচির খুব ভালো লাগলো। সে ঝুকে পড়ে সে চিহ্নটার গায়ে চুমু খেলো। এবং বললো, 'হে আমার ক্ষত, আমার প্রিয় ক্ষত, আমার ছোটখাট কোমল ক্ষত!'

এর পরে সে তাঁবুতে গিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো। নির্ভয়ে সে এমন এক লম্বা ঘুম দিলো যে, পরদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গলো তখন তাঁবুর ভেতরে রোদ এসে পড়েছে। চাচা মামনে চাটাই বুনছে, এবং তার মা তাঁবুর বাইরে রুটি পাকাতে ব্যস্ত।

পরদিন রাত দু'টো অবধি লাচি গুলের প্রতীক্ষা করলো। কিন্তু ব্রীজের উপর কারো ছায়াই দেখা গেলো না। পরদিনও তার প্রতীক্ষায় থাকলো লাচি। কিন্তু গুলকে সে কোথাও দেখতে পেলো না।

তিন-চার দিন অপেক্ষা করার পর লাচিও মন থেকে ব্যাপারটা মুছে ফেললো। ক্ষতস্থানটা এখন শুকিয়ে গেছে। কিন্তু তার উপর মরা চামড়া জমাট বেঁধে আছে। লাচি ধীরে ধীরে নখ দিয়ে মরা চামড়া-

গুলো তুলে পরিষ্কার করে দিলো। এখন ভেতর থেকে সাদা আর লাল চকচকে নতুন চামড়া বেরুচ্ছে, যেটা দেখে লাচির মনে আর চুমু খাওয়ার ইচ্ছে জাগলো না। বরং এক রকমের ঘৃণার উদ্রেক হলো। এবং তার মা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কিসের দাগ?' তখন ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো লাচি, 'একটা কুত্তার দাঁতের দাগ।'

মা মুহূর্তের জন্য গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখলো। পরে চুপ মেরে গেলো।

গত বিশ দিনে লাচি দুমারু সর্দারের সত্তর টাকা শোধ করেছে। ভিক্ষা করে, কখনো বা চুরি করে। কিন্তু এখন ইয়ার্ড থেকে কয়লা চুরি করা এক প্রকার কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর মোরগ তো সবদিন ধরাও যায় না। রেলওয়ের কোয়ার্টারের সবাই এখন সাবধান হয়ে গেছে। কেননা লাচির কীর্তিকাহিনী এলাকার সবাই জেনে গেছে।

লাচিকে এখন কখনো কখনো ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডের দিকে যেতে দেখলেই হামিদে তার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠে, 'ওই যে সাড়ে তিনশর ছুকরী যাচ্ছে।'

লাচি যদিও চুপ করে থাকে, তবু তারা আবার বলে, 'আমাদের বললে সাড়ে তিনশ কেন, সাড়ে তিন হাজার তার পায়ের নীচে ছুঁড়ে দিতে পারি।'

এর পরও যদি লাচি চুপ থাকে, তাহলে সে আরো জোরে বলে উঠে, 'আমাদের কথা শুনলে সাড়ে তিন হাজার কি, সাড়ে তিন লাখ নিয়ে দিতে পারি। চাইলে কোন ছবির হিরোইনও বানিয়ে দিতে পারি। তবে একটা শর্ত আছে……

এ কথায় বিরক্ত হয়ে লাচি ওদের দিকে থুথু ছুঁড়ে মারে। তখন ড্রাইভারের দল আরো জোরে হেসে উঠে। আর লাচি রাগে-দুঃখে ওখান থেকে দ্রুতপদে চলে আসে।

এখন সে আর ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে না। দু'-একজন হলে লাচি ওদের সাথেই কথা কাটাকাটি শুরু করে দিতো। কিন্তু ব্যাপারটা এখন এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যে, ভদ্র-অভদ্র, ছোট-বড় সবাই ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে।

যে পরিবেশে লাচি জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, সে পরিবেশে গিয়ে কেউ চিন্তাও করতে পারবে না যে, লাচি নিজেকে বিক্রি করার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করে যাচ্ছে।

'আরে সাব, যাযাবর মেয়েদের না আছে কোন ঘর-দোর, না আছে মা-বাবার ঠিকানা। কিসের উপর ভিত্তি করে ওরা বেঁচে আছে?'

মনে হচ্ছে যেন লাচি দুমারুর উপর কোন শর্ত আরোপ করেনি, বরং পুরো এলাকার মান-সম্ভ্রমের উপর চ্যালেঞ্জ করেছে। এখন সবাই, যারা ইতিপূর্বে কখনো লাচির কোন ব্যাপারেই মাথা ঘামায়নি, তারাও এখন চাচ্ছে যে লাচি যেন তার শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। যেন নিজের মান-সম্মান হারিয়ে বসে। মনের কথা তারা কেউ মুখে প্রকাশ করে না, তবে অনেকেই চায় এই নীচ হীন যাযাবর মেয়েটির ইজ্জত ছিনিয়ে নেয়া হোক। এই হারামজাদি কি আমাদের ঘরের মেয়েছেলেদের নষ্টের পথে নিয়ে যেতে চায়!

এজন্যেই এখন অনেকেই—যারা ইতিপূর্বে তাকে কেবল হাসিঠাট্টাই করতো এবং মনকে সামান্য প্রফুল্ল রাখার জন্য দু'চার আনা ভিক্ষেও দিতো, এখন ইচ্ছে করে ওকে এক পয়সাও ভিক্ষা দেয় না। কেউ কেউ তো পরিষ্কার বলে দেয়, 'যৌবন চলে গেলে তারপর ভিক্ষা দেবো।'

'দিনটা আগে আসতে দাও, তখন দু'আনা কেন, দু'শ নিয়ে নিও।'

লাচি অনুনয় বিনয় করলে ওরা বরং আরো উপভোগ করে। কিন্তু এক পাইও ভিক্ষা দেয় না।

এই এলাকার সম্মানের প্রশ্ন। আর সম্মান হচ্ছে একটা পুতঃ পবিত্র জিনিষ……মানুষের মুক্তিদাতা! তা ভদ্রঘরের মেয়ে আর যাযাবরের মেয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য তো থাকা চাই!

একদিন লাচি কয়লা চুরি করতে গিয়ে ঠিক মওকা মতো আবারো ধরা পড়ে গেলো। ইয়ার্ডের সান্ত্রী এমনিতে সারাদিন চক্কর লাগায়। বিশেষ করে লাচির উপরই নজর রাখে। এজন্যই দিনে কয়লা চুরি করা লাচি ধরতে গেলে ছেড়েই দিয়েছে। এখন সে রাতের অন্ধকারেই কয়লার ডিপোতে ছাপা মারে। এখানে হাজার হাজার মণ কয়লা স্তূপীকৃত করে রাখা। তার থেকে কয়েক সের চুরি করে নিয়ে গেলে কেউ টেরও পাবে না, কারো কোন ক্ষতিও হবে না।

লাচি যে পবিবেশে মানুষ, সে পরিবেশে চুরিকে ঠিক চুরি বলে মনে করে না। ওরা তো দস্তুর মতো দিন-দুপুরে কয়লা চুরি করে। কিন্তু এখন সান্ত্রীর কড়া দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কয়লার ডিপো পর্যন্ত পৌঁছানোও রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ষ্টেশন মাষ্টার রেসকলাল তো বিরক্ত হয়ে শেষে আদেশই জারী করে দিলেন, যেন লাচিকে ষ্টেশন ইয়ার্ডে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়।

আজ রাতের অন্ধকারে লাচি যখন ধীরে ধীয়ে কয়লা চুরি করার জন্য এগিয়ে গেলো এবং অনেক কয়লা ওড়নার আঁচলে ভরে নিলো তখনই পেছন থেকে কে যেন এসে তাকে ধরে ফেললো।

লাচির মুখ দিয়ে একটা আর্ত চিৎকার বেরুলো।

সে দেখলো, ইয়ার্ডের সান্ত্রী দত্ত নিজের লম্বা ময়লা দাঁত বের করে হাসছে।

'ছেড়ে দে আমাকে।'

'চল ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে।'

'মাফ করে দে আমাকে' লাচি বিনয়ের সাথে বললো, 'আর কয়লা চুরি করবো না আমি।'

'গেলি, না লাথি মারবো?' দত্ত রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতো দিতে দিতে বললো।

'আরে কি হলো, মাত্র তো কয়েক সের কয়লা। সব যাযাবর মেয়েরা নিয়ে যায়। তোদের রেলওয়ে কোয়ার্টারের সমস্ত চাকর-বাকররা নিয়ে যেতে পারে, আমি নিয়ে গেলে কি ক্ষতি! স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টারের চুলাও তো এই কয়লা দিয়েই জ্বলে। আমি জানি

না মনে করেছো—আমি এমন কি ক্ষতি করে ফেললাম রে দত্ত !'

'আমি কিছু জানি না, তোকে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, এই রইলো তোর কয়লা।'

লাচি আঁচলের সব কয়লা ওখানেই ফেলে দিলো।

'এবার তো আমাকে যেতে দে।'

দত্ত ভয় দেখাবার জন্য রাইফেল সোজা করে বললো, 'যদি না যাস এক্ষুণি গুলি মারবো।'

মাথা নত করে লাচি ধীরে ধীরে দত্তর সাথে হাঁটতে লাগলো।

তখন রাত দেড়টা। তিনটার দিকে গভর্ণর সাহেবের স্পেশাল ট্রেন যাবে। তাই ষ্টেশন মাষ্টার রেসকলাল এখনো বাসায় যাননি। ষ্টেশনের অন্যান্য ষ্টাফরাও এ কারণে বড় সন্তুষ্ট। এবং যার যার ডিউটিতে ব্যস্ত। সান্ত্রী দত্ত যখন লাচিকে নিয়ে ষ্টেশন মাষ্টারের কক্ষে প্রবেশ করে, তখন ষ্টেশন মাষ্টার রেসকলাল ছাড়া কক্ষে আর কেউ ছিলো না। তিনি তখন ফোনে জংশন ষ্টেশন থেকে গভর্ণরের স্পেশাল ট্রেনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী শুনছিলেন।

তিনি দত্তরাম আর লাচির দিকে এক নজর তাকালেন। লাচি আজ খুব ভীত-সন্ত্রস্তভাবে এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেসকলাল হাত ইশারায় দত্তকে কামরা থেকে চলে যেতে বললেন।

দত্ত কামরা থেকে বেরিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো।

রেসকলাল ফোনে কথা বলা শেষ করে লাচির দিকে ঘুরে গুরু-গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এদিকে এসো।'

লাচি ভয়ে ভয়ে তার দিকে এগুতে লাগলো। ওর অসহায় মাখা চেহারায় এমন এক আকর্ষণ ছিলো, যা দেখে রেসকলালের মনটা গলে গেলো। তিনি বড় কোমল স্বরে বললেন, 'তুই তো খুব ভালো মেয়ে। তবু কয়লা চুরি করিস কেন ?'

লাচি বিনয়ের সাথে বললো, 'ষ্টেশন মাষ্টার সাব, আর চুরি করবো না। এবারের মতো মাফ করে দাও।'

'কিন্তু এসব কাজ কেন করো তুমি?'

'তুমি তো জান মাষ্টার সাব, সারা এলাকার লোক জানে।'

'সেই সাড়ে তিনশর কাহিনী?'

'হ্যাঁ'। বলেই লাচি দৃষ্টি নামিয়ে নিলো।

'কত টাকা শোধ করেছো?'

'আশি টাকা।'

লাচি এমনভাবে লজ্জিত, বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো যে, রেসকলালের বড় মায়া হলো। তিনি বার দু'য়েক নিজের টেবিলের ড্রয়ার খুললেন, বন্ধ করলেন। খুললেন, আবার বন্ধ করলেন। শেষে ড্রয়ারটা আবার খুলে ভেতর থেকে কিছু নোট বের করলেন। এবং তা লাচির হাতে দিয়ে বললেন, 'নে, টাকাগুলো ধর, বদমাশটাকে দিয়ে দিস।'

লাচি যেন কৃতজ্ঞতার ভারে ডুবে গেলো, ঝুকে পড়লো। ঝুকে রেসকলালের হাঁটু স্পর্শ করলো। এবং যেই মাত্র উঠে দাঁড়ালো, নিজেকে রেসকলালের দু'বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ পেলো।

রেসকলালের পাতলা-পুতলা ক্ষুধার্ত চেহারায় সেই একই আবেগের কাঁপন দেখতে পেলো লাচি। সেই একই রঙ, একই ভঙ্গী, একই লালসা, তার কাছে মনে হলো যেন সে রেসকলালের বেশে মাধুলাল কাঁচা পাপতিয়াকে দেখছে। সেই গা শির শির করা, কিল-বিল করা কোন ময়লা অপবিত্র পোকা যেন। লাচির মনে একরাশ ঘৃণার উদ্রেক করলো।

রেসকলাল তার চেহারার উপর ঝুকে পড়তেই এক ঝটকায় দু'বাহুর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলো লাচি। এবং তার গালে এমন একটা চড় মারলো যে, রেসকলাল মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। এবং পড়ে গিয়েই জোরে জোরে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, 'পুলিশ! পুলিশ!'

তৎক্ষণাৎ দত্ত ছুটে এসে ভেতরে ঢুকলো। তাকে দেখে রেসকলালেরও সাহস ফিরে এলো। তিনি মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'হারামজাদীকে হাজতে বন্ধ করে

রাখো। হতভাগী আমাদের ইয়ার্ড থেকে কয়লা চুরি করে।'

লাচি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'আর তুমি যে আমার সবকিছু চুরি করছিলে? বুড়ো ধারী কোথাকার। লজ্জা করে না, তোমার মেয়ের সমান……'

'নিয়ে যাও, ওকে নিয়ে যাও। হাজতে পুরে দাও।' রেসকলাল রাগে আগুন বরাবর হয়ে বললেন।

লাচি সামনে গিয়ে হাত চালাতে চালাতে বললো, 'দাঁড়া, এক্ষুণি খামচে তোর মুখের চামড়া তুলে ফেলবো।'

কিন্তু তার আগেই দত্ত লাচিকে জোর করে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলো। এবং ষ্টেশনের হাজতে পুরে দিলো।

তিন দিন কয়েদখানায় বন্দী থাকার পর চতুর্থ দিন হাজতের সান্ত্রী লাচিকে ষ্টেশন মাষ্টারের আদেশে হাজত থেকে বের করে দিলো।

টলতে টলতে লাচি হাজত থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুল দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু এ গুল যেন অন্য এক গুল।

তার চেহারা টকটকে লাল, তার উপর একরাশ ধূলিকণা আর হতাশার ছাপ স্পষ্ট। তার পরনে প্যাণ্ট সার্টের পরিবর্তে পাঠানী সেলোয়ার আর কামিজ। কামিজের উপর কালো জ্যাকেট। মাথায় লুঙ্গি এবং তার উপর একটা বাদশাহী টুপী। কালো জ্যাকেটের উপর এক খণ্ড চামড়া আঁটা। চামড়ার সাথে শান-পাথরের একটা চরকি পিঠের উপর বাঁধা। আর সামনে চামড়ার বিভিন্ন খোপে চাকু, ছোরা এবং কাঁচি ঝুলানো।

'এ কি অবস্থা করে রেখেছো শরীরের?' লাচি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'বাবা আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে।'

'তোমার জন্য টাকা চাইতেই বাবা খুব রেগে গেলো। বললো—

বেলুচর ছেলে হয়ে তুই যাযাবর মেয়ের সাথে প্রেম করিস? তিনশ কেন, তিন টাকাও তোকে আমি দেবো না, যা বেরিয়ে যা! এ মুহূর্তে বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে। এ কথা বলেই বাবা একটা লাঠি নিয়ে আমার পিছু ছুটলো। আমি ঘর থেকে দৌড়ে পালিয়ে এলাম।'

'তা এতোদিন কোথায় ছিলে, সেদিন ব্রীজের উপর এলে না কেন?'

'কোন মুখে আসবো? ভাবলাম টাকা যোগাড় করে তারপর আসবো এবং তোমার হাতে তুলে দেবো। যার দরুন দু'তিন জায়গায় চাকুরীর চেষ্টাও করেছি। এদিকে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে একটি ক্লার্কের চাকুরী খালি আছে। কিন্তু ওরা বললো—তুমি এ এলাকার লোক নও, এ চাকুরী তুমি পেতে পারো না। কেউ বললো—তুমি পাঠান। কেউ বললো—তোমাকে দেখলে ভয় লাগে। এখন আমি কি করি, কোথায় যাই? এই ফাঁকে বান্দার আবদুস সামাদ খান আমার এই উপকারটা করলো। সে আমাদেরই নিজস্ব লোক, আমাকে কাজটায় লাগিয়ে দিলো। দৈনিক দু'আড়াই টাকা আসে। আমি তোমার জন্য ত্রিশ টাকার মতো জমাও করেছি।'.....

'কোথায় সে ত্রিশ টাকা?' লাচি খুশী হয়ে সামনে হাত বাড়িয়ে দিলো।

গুল মাথা নত করে বললো, 'সে তো খরচ হয়ে গেছে।'

'খরচ করে ফেলেছো তুমি?' লাচি চিৎকার দিয়ে বললো।

'রেসকলালকে দিয়েছি। কি করবো, না দিলে তোমাকে হাজত থেকে বের করতাম কি করে?'

লাচি প্ল্যাটফরমের সিমেন্টের উপরই বসে পড়লো। সামনেই ইয়ার্ডের বড় বড় লোহার পাত—নিষ্প্রাণ, নির্দয় এবং যাবতীয় আবেগ থেকে মুক্ত। পাতগুলোর ওপারেই রেলওয়ের বিভিন্ন লোহালক্কড়ের স্তূপ। তারপরে রেলওয়ের কোয়ার্টার। কোয়ার্টারগুলোর ওপারেই যাযাবরদের তাঁবু। তার পেছনে বিভিন্ন গাছগাছালির সারি চলে গেছে। তার তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মতো নগ্ন ডাল-পালাগুলো যেন তাঁবুগুলোর গর্দানের উপর ঝুলে আছে। যেদিন শাখায় ফুল ফুটবে.....

যেদিন শাখায় শাখায়,—কিন্তু শাখায় শাখায় ফুল ফুটার

পরিবর্তে যদি সাদা সাদা টাকার ফুল ফুটতো? তাহলে সে টাকার ফুল ছিঁড়ে নিয়ে দুমারুর ঝুলি ভরিয়ে দিতো লাচি।

তা এসব শাখা-প্রশাখায় ফুল ফুটে কেন? টাকা কেন ফুটে না? স্রেফ এক মৌসুমে যদি ফুলের পরিবর্তে টাকা ফুটতো!

লাচি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো এবং ইয়ার্ড থেকে চলে যেতে লাগলো।

গুলও তার সাথে সাথে চললো।

বেখেয়ালে ওরা দু'জনই হাঁটতে হাঁটতে পুরনো ব্রীজের উপর গিয়ে দাঁড়ালো। এবং দু'জনেই হতাশ একরাশ শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওখানে কিছু নেই, কোথাও কোন কিছু ওদের দৃষ্টিগোচর হলো না।

গুল দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বললো, 'বসন্ত আসতে এখনো অনেক দেরী। আস্তে আস্তে আমি তোমার সমস্ত কর্জ শোধ করে দেবো।'

'এসব নগ্ন ডাল-পালাগুলোকে আমার বড্ড ভয় লাগে। প্রতিদিন ভোরে উঠে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, কোন শাখায় চোখ ফুটেনি তো! কোন শাখায় পাতা দেখা দেয়নি তো, কলি ফুটেনি তো? বসন্ত আসছে শুনলেই আমার ভয় করে।'

'খোদা, বসন্ত যেন কোনদিনই না আসে।' গুল হতাশায় ভরা একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললো।

ওরা দুজন চুপ করে থাকলো।

এক সময় হঠাৎ হেসে উঠলো গুল।

'হাসছো কেন গুল?' লাচি তার দিকে বড় অবাক চোখে তাকিয়ে বললো।

'আজকাল আমিও মানুষের সাথে বেঈমানী করছি।'

'কি বেঈমানী? কয়লা চুরি করো তুমি?'

'না। আমি যখন মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের ছোরা, চাকু ইত্যাদিতে শান দেই তখন ইচ্ছে করে ছোরার এক পিঠেই শুধু

শান দেই।'

'কেন?'

'যাতে ছোরা, চাকু আবারো ভোতা হয়ে যায়, এবং মানুষ আমাকে যেন আবার ডাকে।'

'লাচি জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

গুলের এই দুষ্টুমী তার খুব ভালো লাগলো। এক সময় তার কাছে মনে হলো যেন গুল তারই একজন সঙ্গী, তাদের মতোই একজন মানুষ। ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ গুলের একেবারে অতি নিকটে চলে এলো লাচি। এবং হাসতে হাসতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, 'দেখি, তোমার হাত দেখাও!'

গুল হাতখানা লাচির হাতে ছেড়ে দিলো।

লাচি গুলের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে গভীর ভাবে দেখলো। মৃদু চাপ দিলো। পরে খুশী হয়ে বললো, 'হ্যাঁ, কিছু পার্থক্য দেখা দিয়েছে।'

'কি পার্থক্য?' গুল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আগে এ হাত নরম ছিলো, এখন শক্ত হয়েছে।'

গুল চুপ থাকলো।

লাচি তার চেহারার দিকে তাকালো, বললো, 'এখন তোমার চেহারায় ধূলোবালি জমেছে। দাড়ীও বড় হয়ে গেছে। তোমার চেহারা বাবুদের মতো এখন আর সাফ-সুতরা, চকচকে নয়।'

গুল বিমর্ষভাবে বললো, 'কি করবো আমার কাজই এমন যে, সারাদিন ঘুরতে হয়। ঠিক আছে, কাল থেকে সেভ করে বেরুবো।'

'না, সেভ করো না।' লাচি জোর দিয়ে বললো, 'তোমার এই লম্বা উস্কো-খুস্কো দাড়ীঅলা চেহারাই আমার খুব পছন্দ।'

লাচির হাতের ভেতরে ধরে-রাখা গুলের হাত কেঁপে কেঁপে উঠলো। যেন পাখী কোন অচেনা নীড়ে তৃণলতা খুঁজছে। এবং এখন নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে তাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। তেমনি গুলও লাচির হাতে নিজের হাতখানা ছেড়ে দিলো।

তার মনের আকাশে কিসের যেন এক মিষ্টি ঢেউ খেলে গেলো।

এবং সে ঢেউ তার হৃদয়কে গানে-আনন্দে ভরিয়ে তুললো। মনটা তার একরাশ প্রশান্তিতে ভরে গেলো।

লাচি গুলের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। এবং তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'গুল!'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে বিয়ে করবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে একটি ঘর দেবে?'

'হ্যাঁ।'

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

'আমার জন্য বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে তুমি আমার প্রতীক্ষায় থাকবে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এসব কেন জিজ্ঞেস করছো?'

'ব্যাস, আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।' লাচি প্রশান্তি মাখা একটা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে বললো, 'আর কিছু চাওয়ার নেই আমার।'

লাচির হাতের বাঁধন, তার সারা শরীর শিথিল হয়ে গেলো। এবং সে হঠাৎ গুলের বুকের সঙ্গে লেপ্টে গেলো।

গুল ভয় পেয়ে বললো, 'সারা ইয়ার্ডের লোক দেখছে।'

'দেখুক, সারা ইয়ার্ড কি, সারা পৃথিবী দেখুক, আমি তোমারই।'

লাচি পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে বললো। এবং দু'হাতে গুলের গলা জড়িয়ে ধরলো।

গুল ঝুকে পড়ে লাচির চোখের সবুজ ঝিলে তাকিয়ে দেখলো, ওখানে অনেক অনেক দূর অবধি শুধু পরিতৃপ্তির পথই ফুটে রয়েছে।

গুল লাচিকে দু'বাহুতে চেপে ধরলো। এবং তার ঠোঁট লাচির কুমারী ঠোঁটের দিকে ঝুকে গেলো।

ব্রীজের নীচ দিয়ে ফিফটিন ডাউন গড় গড় আওয়াজ তুলে

শোরগোল করতে করতে চলে যাচ্ছে। তার সিটির হৃদয়গ্রাহী আওয়াজ লাচি আর গুলের হৃদয়ে আনন্দের ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে গেলো। যেন কুহু কুহু ধ্বনি তুলে কোন কোকিল দূর আকাশে উড়ে চলে যাচ্ছে।

সবুজ ঝাণ্ডা নড়লো। সিগন্যাল উঠলো। এবং প্রেমকাতর কোন নারীর বাহুর মতো একদিকে ঢলে পড়লো। পয়েন্টসম্যান পয়েন্ট বদলালো। নারীর হৃদয় তার পুরনো লাইন ছেড়ে নতুন লাইনে ছুটে যাচ্ছে। নতুন যাত্রা, নতুন গন্তব্য, নতুন পথ—অচেনা অজানা যে পথ জীবনকে আরেক নতুন দিগন্তে নিয়ে যায়।

এ ঘটনার পনের বিশদিন পর আকাশী রঙের একখানি ফ্লাইমাউথ দুমারুর তাঁবুর কাছে রাস্তার উপর এসে থামলো। গাড়ীটা এয়ার-পোর্টের দিকে যাচ্ছিলো। ভেতর থেকে ঈষৎ বাদামী রঙের স্যুট পরিহিতি ফিটফাট এক যুবক বেরুলো। তার হাতে থ্রি কেসেলের টিন, আঙ্গুলে মূল্যবান হীরার আংটি। টাইয়ের উপর ছোট একটা মণি ঝকঝক করছে।

দুমারু যুবকটিকে ঝুকে পড়ে সালাম করলো।

যুবক দুমারুকে জিজ্ঞেস করলো, 'আর কতদিন আমাকে প্রতীক্ষা করতে হবে?'

'বসন্ত আসুক।'

যুবক বড়ই আক্ষেপমাখা দৃষ্টিতে গাছের নগ্ন ডাল-পালার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বসন্ত তো দু'মাসের মধ্যেও আসবে না।'

'না বাবু, এবার তাড়াতাড়ি চলে আসবে বসন্ত।'

'ততদিনে হয়তো সমস্ত টাকা শোধ করে দেবে সে।'

'কি করে শোধ করবে? তা সম্ভব নয় বাবু। এই বিশ দিনে আমাকে মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে।'

'তবু সে শোধ করে দেবে। হামিদে আমাকে জানালো, কোন

এক পাঠান যুবক চাকু ছোরা শান দেয়, সে নাকি ওকে প্রতিদিন পয়সা দেয়। ওরা প্রতিরাতে ব্রীজের উপর মিলিত হয়।'

'আমি জানি বাবু।'

'তুমি ছাই জানো।' যুবকটি রেগে গিয়ে বললো, 'শালী, দু'পয়সার ছুকরীর এতো বিলাসিতা! তোমাকে দিয়ে যদি সম্ভব না হয় আমাকে পরিষ্কার বলে দাও, আমি শালীর উপর গুণ্ডা লেলিয়ে দেবো। দু'মিনিটের মধ্যে তুলে নিয়ে আসবে ওকে। এ-তো সামান্য কাজ।'

'দেরী তো আর সামান্য ক'টা দিন।' দুমারু ঈষৎ লাজুক স্বরে বললো, 'বসন্ত আসুক, কলি তখন আপনা থেকেই ফুটবে।'

'তোমার শুধু গালভরা কথা।'

যুবক কপালে একরাশ বলিরেখা ফুটিয়ে বললো। এবং গাড়ীর দিকে ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো।

দুমারু সামনে এগিয়ে ভিখারীর মতো কাতর স্বরে বললো, 'একশটি টাকা দিয়ে যাও।'

'এ পর্যন্ত চারশ টাকা নিয়ে গেছো তুমি।'

'ব্যাস, আর মাত্র একশটা টাকা দিয়ে যাও। বসন্তের আগে আর চাইবো না, স্রেফ একশ টাকা।'

যুবক চামড়ার বড় ব্যাগটা খুললো। তার ভেতরে একশ টাকার হাজার হাজার নোট ভর্তি। দুমারুর চোখজোড়া চক চক করে উঠলো। যুবক নিতান্তই অবহেলা ভরে একখানা শতি নোট দুমারুর হাতে ধরিয়ে দিলো। দুমারু হাঁটু পর্যন্ত ঝুকে পড়ে কৃতজ্ঞতা জানালো।

যুবক দুমারুর সালামের কোন জবাবই দিলো না। বরং বড় গর্বভরে সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে গাড়ীতে করে মিলিয়ে গেলো।

দুমারু শতি নোট হাতে নিয়ে খুশী মনে আপন তাঁবুতে ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো, সামনে রেগি দাঁড়িয়ে আছে। রেগির চোখে-মুখে একটা দুষ্টুমীর হাসি খেলা করছিলো। আপন

মনে গুন গুন করছিলো সে। দুমারু তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি শতি নোট্‌টা পকেটে রেখে দিলো। তারপর রেগির দৃষ্টি বাঁচিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে চলে যেতে লাগলো। এ সময় দুমারুর পথ রোধ করে দাঁড়ালো রেগি।

'কি হলো?' দুমারু রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

'লোকটা কে?'

'চমন ভাই, কোরলা রোডে তার একটা প্লাষ্টিকের কারখানা আছে।'

'সে তোমাকে একশ টাকা কেন দিলো?'

'সেটা আমার আর তার ব্যাপার, মাঝখানে তুমি বলার কে?'

'আমি সব জানি। সব শুনেছি আমি। এখন আমার ভাগটা দিয়ে দাও। আমার মেয়েকে বিক্রি করার তুমি কে?'

রেগি দুমারুর জামার কলার চেপে ধরলো।

'আরে এতো চেঁচামেচি করো না।'

দুমারু অনেক চালাকি করে গলার স্বর বদলে ফেলে বললো, 'আমি তোমাকে ভাগ দিচ্ছি, বরং তার চেয়ে বেশীই দিচ্ছি!'

'তা দাও।'

'জামার কলার তো ছাড়ো!'

রেগি কলার ছেড়ে দিলো।

দুমারু পকেট হাতড়ে একখানি দশ টাকার নোট বের করে বললো, 'এই নাও দশ টাকা! আর দশ টাকা দেবো, যদি তুমি আমার একটা কাজ করে দাও।'

'কি কাজ?'

দুমারু গভীর দৃষ্টিতে রেগিকে দেখলো, পরে বললো, 'তুমি কি চাও তোমার মেয়ে আমাদের গোত্রেই থাকুক?'

'হ্যাঁ।'

'সে কোন বিশেষ শহরের, কোন বিশেষ গ্রামের কিম্বা কোন বিশেষ লোকের হয়ে না থাকুক?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তোমাকে আমার কাজটা করতেই হবে। আমি তোমাকে

তার জন্য দশ টাকা দেবো।'

'কাজটা কি তা তো বলবে!'

'এদিকে আমার কাছে এসো।'

রেগি দুমারুর কাছে এলো।

দুমারু রেগির কানে কানে কি যেন বললো।

দুমারুর কথা শুনে রেগির চেহারা বেশ কিছুক্ষণের জন্য চিন্তান্বিত হলো, ভীতিগ্রস্ত হলো। পরে হঠাৎ তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে দুমারুকে বললো, 'এ কাজের জন্য ত্রিশ টাকা লাগবে।'

'ত্রিশ টাকা বেশী। আমি পনের টাকা দেবো।'

'পনের টাকা নেবো না, পঁচিশ টাকা নেবো।'

কথা কাটাকাটির পর শেষে পঁচিশ টাকায় কথা পাকা হলো।

রেগি বললো, 'বের করো পঁচিশ টাকা।'

'এখন না।' দুমারু হেসে বললো, 'দোস্ত আগে নিজের কাজ করো, পঁচিশ টাকাই পাবে। আমাকে বিশ্বাস না হলে বলো, টাকা মামনের কাছে জমা রাখি।'

'না। মামনে হারামজাদার চেয়ে তুমি হারামজাদা অনেক ভালো।'

রেগি হেসে বললো। তারপর দশ টাকার নোটখানি পকেটে পুরে গুন গুন করতে করতে চলে গেলো।

আজ লাচি মাত্র বারো আনা উপার্জন করেছে। পাঁচসিকা এনে দিয়েছে গুল। এভাবে দু'টাকা করে কত মাসে কর্জ শোধ করবে?

লাচি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বার বার কেবল গাছগাছালির দিকে তাকাতে থাকলো।

গাছগাছালির ছাল রঙ-পরিবর্তন করছে। ঈষৎ কালচে ডাল-পালা থেকে সবুজ শাখা-প্রশাখা বেরুচ্ছে। কিছুদিন পর শাখা-প্রশাখা থেকে নরম নরম সবুজ পাতা বেরুবে। লাল লাল ফুল ফুটবে এবং আমারও কপাল ভাঙ্গবে।

লাচির মন কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইলো। গুল তাকে সান্ত্বনা

দিতে দিতে বললো, 'ভয় পেয়ো না, সব ঠিকে হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমি টাকা শোধ করে দেবো। দিনরাত পরিশ্রম করছি। একটা ফিল্ম ষ্টুডিওতে দারোয়ানের চাকুরী খালি হয়েছে। ষ্টুডিওর মালিক আমাকে আগামীকাল যেতে বলেছে। পচাত্তর টাকা বেতন। সন্ধ্যা ছ'টায় ডুটি হবে। ডুটির পরই আমি আবার শান-পাথর নিয়ে বেরবো। কিছু এখান থেকে আসবে, কিছু ওখান থেকে আসবে। টাকা আসবেই, কর্জও শোধ হয়ে যাবে।'

লাচির মনে আবারো প্রফুল্লতা ফিরে এলো। খুশী হয়ে বললো, 'তারপর—? তারপর—?'

'তারপর আমরা দু'জন ঘর সংসার করবো। বান্দ্রার আবদুস সামাদ আমার কাছে ওয়াদা করেছে, বান্দ্রার দিকে একখানি ঘর নিয়ে দেবে। আমরা দু'জন ওখানে থাকবো।'

'আমরা দু'জন?' লাচি খুশীর চোটে যেন চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'আমার ঘর?'

'তবে ঘরটা একটু ছোট্ট হবে।'

'আহা আমার ঘর!'

লাচি গুলের বুকের সাথে সেঁটে গিয়ে বললো। তার ছোট কচি মন খুশীতে কেঁপে কেঁপে উঠলো।

'আহা তখন তো সত্যি সত্যি বসন্তের দোলা লাগবে।'

গুল লাচিকে বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত করতে করতে বললো, 'আচ্ছা, এখন আমি আসি। রাতে আবার আসবো ব্রীজের উপর।'

লাচি দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে বললো, 'তুমি প্রতিদিন পায়ে হেঁটে বান্দ্রা যাও, আবার ওখান থেকে পায়ে হেঁটে রাতে ব্রীজে আসো। স্রেফ আমাকে দেখার জন্য, এটা ঠিক না।'

লাচি পকেট হাতড়ে চার আনা পয়সা বের করলো এবং তা গুলকে দিতে দিতে বললো, 'বাসে যাওয়া-আসার ভাড়াটা তো নিয়ে যাও।'

'না লাচি!'

গুল খুবই কোমল স্বরে বললো, 'তুমি এ চার আনাও দুমারুকে দিয়ে দাও। কর্জ থেকে চার আনা পয়সা শোধ হবে, চিন্তা করে দেখো।'

'কিন্তু তুমি কতো ক্লান্ত হয়ে পড়ো!'

গুল হেসে বললো, 'তুমি যখন আমার ঘরে আসবে, তখন আমার পা টিপে দিলেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।'

'তা হলে আমি তোমার পা টিপে দেবো, হাঁটু টিপে দেবো, পিঠ, কোমর, হাত, ঘাড়, মাথা সব টিপে দেবো। তোমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সব ক্লান্তি আমি নিজের দু'বাহুতে নিয়ে নেবো গুল, আমার প্রিয় গুল!'

লাচি দু'হাতে গুলের মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিলো।

গুল লাচিকে আদর করলো। পরে সেই চার আনা পয়সা লাচির পকেটে পুরে দিলো। এবং রাতে ব্রীজে আসার কথা দিয়ে লাচির কাছ থেকে বিদায় নিলো।

লাচি এখন তার মা আর মামনের সাথে খুব বেশী কথা-বার্তা বলে না। এতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তারা এখন পরস্পর আগন্তুকের মতো ব্যবহার করে। কথাবার্তা হলেও, নিতান্তই অপরিচিতের মতো।

লাচি এখন তাঁবুতে ফিরে এসেই তার মা আর মামনের জন্য রান্নাবান্না করে। থালাবাসন সাফ করে। নিজে খায়। শোয়ার সময় হলে তাঁবুর ভেতর চাটাই পেতে শুয়ে পড়ে। রাত দু'টো অবধি, হয় জেগে থাকে, না হয় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়লেও রাত দু'টোয় ঠিকই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর ব্রীজের উপর ছুটে আসে।

আজকেও লাচি তাই করলো। দূর থেকেই সে দেখলো রাতের অন্ধকারে ব্রীজের উপর একটা আবছা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। প্রেমের আতিশয্যে তার চলার গতি আরো দ্রুত হয়। এবং তাড়াতাড়ি ব্রীজের উপর পৌঁছে গেলো সে।

কিন্তু ছায়া যখন তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, দেখে লাচি ভীষণ চমকে উঠলো।

সে গুল নয়।

পাতলা ছিপছিপে শরীরের, চোয়াল ভাঙ্গা, বেঁটে-খাটো রামু।

'রামু!' লাচি জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুমি এখানে?'

পরে ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'গুল কোথায়?'

'হাসপাতালে।' রামু থেমে থেমে বললো।

'হাসপাতালে?' লাচি আশ্চর্য হয়ে বললো।

পরে আপনা থেকেই তার কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো। সে আর কিছু বলতে পারলো না, কেবল চোখ জোড়া ছানাবড়া করে রামুকে দেখতে থাকলো।

রামু আস্তে আস্তে বললো, 'সে এখান থেকে বান্দ্রা যাচ্ছিলো হেঁটে। ইরলার মোড়েই—যেখানে রাস্তার ধারে ধারে বড়লোকদের বাংলো বাড়ী আর ফাঁকে ফাঁকে ঝোপঝাড় আছে—সেদিক থেকে একজন লোক বেরুলো। এবং তার পেছনে পেছনে এসে এক সময় সুযোগ বুঝে গুলের পিঠে ছোরা বিদ্ধ করে কেটে পড়লো।'

'হ্যাঁয়!'

লাচি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

'গুল লোকটাকে ধরতে চেয়েছিলো, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গাছ-গাছড়ার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে গুল রাস্তার উপর ছটফট করছিলো। সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন সে রাস্তা দিয়েই ঘরে ফিরছিলাম। আমি ইরলায় থাকি তো। বিদ্যুৎ অফিসের পেছনেই ঝুপড়ীতে। আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম আমি, এ সময় রাস্তায় কারো কঁকানি শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, গুল মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। তাড়াতাড়ি তাকে একখানা লরিতে তুলে বান্দ্রা হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। তারপর তোমার কাছে এলাম। গুলই আমাকে বলেছে, তোমাকে এখানে পাবো।'

লাচি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন তার অবস্থা কেমন?'

রামু বললো, 'শরীর থেকে তো অনেক রক্ত গেছে, তবে ডাক্তার

বললো, বাঁচবে।'

'তাহলে আমাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে চলো।'

রামু মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করলো। পরে নিজের পকেটে হাত ঢুকালো এবং পনেরটি টাকা বের করে লাচির হাতে দিতে দিতে বললো, 'টাকাগুলো রেখে দে।'

'টাকা কেন?'

লাচি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

রামু মাথা নত করে বললো, 'তোর কথা আমি শুনেছি। আমি জানি ইজ্জত কি জিনিষ। আমারও একটি মেয়ে ছিলো তোর মতোই। একদিন রেসকলাল তার ইজ্জত লুটে নিলো।'

রামু চুপ করলো।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। পরে ভগ্নহৃদয়ে বললো, 'লুটে না নিলে আমার চাকুরী চলে যেতো·····'

সে আবার চুপ করে থাকলো।

কিছুক্ষণ পর আবার খুব ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে বললো, 'আমি জানি, ইজ্জত কি।'

এরপর সে আর কিছু বললো না। লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে গেলো।

'না না, এ টাকা আমি নেবো না।'

লাচি অশ্রু সম্বরণ করতে করতে বললো, 'তোমার মেয়ে কোথায়?'

'কুয়োয় ডুবে মরেছে।'

রামু মুখ ফিরিয়ে শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

লাচি হতভম্ব হয়ে রইলো।

কত বড় শূন্যতা এই পৃথিবীতে। কত বড় কুয়ো, কত গভীর, কত কালো, কত অন্ধকার এই পৃথিবীর কুয়ো। প্রতিদিন এখানে কত হাজার হাজার ইজ্জত ডুবে যাচ্ছে, তবুও কুয়োর পেট ভরে না।

হঠাৎ রামু লাচির আঁচল চেপে ধরে বললো, 'আমি তোমাকে

আগামী মাসের বেতন থেকে আরো দশ টাকা দেবো। কিন্তু দেখো—ইজ্জত কখনো বিক্রি করো না।'

লাচির মন চাইলো বুড়ো রামুর কাঁধে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে, তাকে 'বাবা বাবা' বলে ডাকতে। কিন্তু অনেক কষ্টে সে অশ্রুরোধ করলো। এবং আস্তে করে বললো, 'আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো।'

গুলকে হাসপাতালে প্রায় দেড় মাসের মতো থাকতে হলো।

তার দেহের ক্ষত আস্তে আস্তে ভালো হতে থাকলেও, তার মনের ক্ষত চাঙ্গা হতেই লাগলো। এবং প্রতিটি মুহূর্ত সে শুধু ভাবছিলো, এখন কি হবে? এরপর কি হবে?

দিন চলে যাচ্ছে। বসন্ত আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। কিন্তু সে তো বিছানায় পড়ে আছে।

লাচি প্রতিদিন হাসপাতালে আসে। দু'বেলাই আসে। বিকেলে যখন দর্শনার্থীদের জন্য গেট খুলে দেয়, তখন নিজের পয়সায় ফলমূল কিনে নিয়ে আসে।

লাচি সব্জী মার্কেটে এক বুড়োর সব্জীর দোকানে চাকুরী নিয়েছে।

বুড়ো এখন অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। তাই এখন আর সব্জীর টুকরি মাথায় নিয়ে ফেরি করতে পারে না। কিন্তু তার কিছু বাঁধা-ধরা গাহাক আছে, যারা সব সময় তার কাছ থেকেই সব্জী নিতে ভালোবাসে। বুড়োর ঘরের খরচাপাতিও এই দোকানের আয় থেকে চলে। গাহাকরা বাকী রাখলেও সময় মতো টাকা শোধ করে দেয়। এ কারণেই বুড়ো লাচিকে রেখে দিয়েছে। এবং প্রতিদিন লাভের তিন ভাগের একভাগ লাচিকে দেয়।

সেই সুবাদে লাচি প্রতিদিন পাঁচ সিকা, দেড় টাকার মতো পায়। কিন্তু হলে কি হবে, তার সবটা তো গুলের জন্য ফলমূল কিনতেই চলে যায়। দুমারুর জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কোনদিন বাসের ভাড়া পর্যন্ত কম পড়ে যায়। তখন লাচিও গুলের নীতি অনুসরণ করে। কেননা প্রেমের নীতিতে পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নিজের প্রাণপ্রিয়ের জন্য সবকিছু করতে হয়।

এই প্রেমের ব্যাপারে লাচির একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। গুল যতদিন সুস্থ ছিলো, লাচির কাছে তেমন ভালো লাগেনি, যে রকম অসুস্থ হবার পর লাগছে। এখন তো প্রতিটি মুহূর্তেই লাচি চায় তার প্রেমিকের শিয়রে বসে কেবল সেবা করে।

কিন্তু হাসপাতালেরও কিছু আইন-কানুন আছে। অবশ্য লাচির মতো সুন্দরী মেয়েকে দেখে হাসপাতালের বিভিন্ন আরদালী আর ডাক্তারদের মনেও সহানুভূতির উদ্রেক করে।

লাচি এলেই আরদালীগুলো যেন কেমন হয়ে যায়। আর ডাক্তাররাও একবারের জায়গায় তিনবার চক্কর লাগায়।

কখনো কখনো ডিউটিরত একজন ডাক্তারের সাথে ফাউ তিন চারজন ডাক্তারও এসে জড়ো হয়ে যায়। যেন তারা বিশেষ কোন রোগীকে দেখতে আসে। কিন্তু নার্সরা ঠিকই অনুধাবন করতে পারে, এদের মনোযোগের আসল কেন্দ্রবিন্দু কোথায়।

এজন্যই নার্সরা লাচির উপর বেশ বিরক্ত। ওকে দেখলেই জ্বলে উঠে। আশেপাশে কোথাও যদি ডাক্তার থাকে, তাহলে নার্সরা লাচিকে কিছু বলে না, বরং বসতে দেয়। কিন্তু ডাক্তার চলে গেলেই নার্সরা লাচিকে অসহিষ্ণু গলায় বাইরে চলে যেতে বলে।

লাচি সব বোঝে। কে তাকে কতটুকুন সহানুভূতি দেখায় এবং তার পেছনে কার কি উদ্দেশ্য লুক্কায়িত, আর কে তাকে ঘৃণা করে সবকিছু লাচি বোঝে। বুঝেও সহ্য করে থাকে।

সবকিছুকে সে স্রেফ একটা হাসির বিনিময়ে ক্ষমা করে দেয়। কারণ সত্যিকার আবেগকে যে বুঝতে পারে, সে সবকিছু সহ্য করতে পারে।

ইতিমধ্যে একদিন বেলুচি, গুলের বাবা খুব ভোরে ভোরে লাচির তাঁবুতে এসে উপস্থিত হলো। লাচি তখন সব্জী মার্কেটে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলো। বেলুচিকে দেখেই সে থতমত খেয়ে গেলো।

বেলুচি বললো, 'তোমার সাথে আমার কিছু কাজ আছে।'

লাচি বললো, 'আমাকে এক্ষুণি সব্জী মার্কেটে পৌঁছতে হবে। তাই এখন দাঁড়াতে পারবো না।'

বেলুচি বললো, 'চলো হাঁটতে হাঁটতে কথাগুলো সেরে নেই।' লাচি হাঁটতে লাগলো। বেলুচিও তার সাথে রওয়ানা দিলো।

লাচি বেলুচির কথা শোনার জন্য দূরের রাস্তা ধরলো। যেটা ইয়ার্ডের বাইরে ঘাসের গুদাম আর করলা রোডের দিকে চলে গেছে। বাসের সেডের কাছ দিয়েই রাস্তাটা চলে গেছে। মাঝখানে কাছেই একটা সিনেমা হল পড়ে। সিনেমা হলের সামনেই রেল-ওয়ের ক্রসিং।

দু'জনেই হাঁটতে হাঁটতে নীরবে প্রায় অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করে ফেলেছে।

শেষে লাচি বললো, 'তুমি কি আমাকে কিছু বলতে এসেছো?'

'তুমি গুলকে ছেড়ে দাও।' অকস্মাৎ বেলুচি বলে উঠলো।

'কেন ছাড়বো?'

'সে আমার ছেলে।' বেলুচি নিশ্চিন্তভাবে বললো।

'সে আমার প্রিয়।' লাচি বড় কোমলস্বরে মাথা নীচু করে বললো।

'তুমি যদি তাকে বিয়ে করে ফেলো তাহলে পুরো সমাজ আমার মুখে থু থু দেবে।'

'সমাজ তো একটা আমারও আছে।'

'তোমাদের যাযাবরদের কি বিশ্বাস। আজ এখানে, কাল ওখানে। তুমি এখান থেকে চলে গেলেই আমার ছেলে তোমাকে ভুলে যাবে।'

লাচি নীরবে হাঁটতে লাগলো।

বেলুচি নিজের পকেট থেকে সাড়ে তিনশ টাকা বের করলো।

'এগুলো নিয়ে যাও, আর আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও।'

'না না।' লাচি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো। এবং দ্রুতগতিতে হাঁটতে লাগলো।

'আরো পঞ্চাশ দিচ্ছি।' বেলুচি আরো পঞ্চাশ টাকা বের করলো।

এক তাড়া নোট তার হাতে কাঁপতে থাকলো।

লাচি নোটগুলোর দিকে ফিরেও তাকালো না। হাত দিয়ে একদিকে সরিয়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো।

বেলুচি তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো, 'শোন শোন!' হাঁফাতে হাঁফাতে বেলুচি বললো, 'তুমি আমাকে বিয়ে করে ফেলো।'

'তোমাকে? বিয়ে?' লাচি হতভম্ব হয়ে রইলো।

'হ্যাঁ। আমি—আমি তোমাকে খুশী করতে পারবো। গুলের স্বাস্থ্য দেখো আর আমার স্বাস্থ্য দেখো।' বেলুচি নিজের বড় বড় গোঁফ জোড়ায় তা দিতে লাগলো।

'আমি তোমাকে খুশী রাখতে পারবো। আমার কাছে টাকা আছে, অনেক টাকা। তোমাকে হাসপাতালে দেখার পর থেকে আমি পাগল হয়ে গেছি।'

হঠাৎ জোরে জোরে হাসতে লাগলো লাচি। এমনিই হাসিটা এসে গেলো।

'হাসছিস কেন?' বেলুচি রাগান্বিত হয়ে বললো।

'হাসছি এজন্য, আমি বাপ-ছেলে দু'জনের মাত্র একজনকে বিয়ে করতে পারি!'

'তাহলে আমাকেই বিয়ে করো।'

বেলুচি অধৈর্য হয়ে বললো, 'পাঁচহাজার টাকার মোহরানা লিখে দিতে তৈরী আছি।' অধৈর্য হয়ে লাচির হাত চেপে ধরলো বেলুচি।

লাচি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলো। এবং বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বললো, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার ছেলের মত নিয়ে এসো। তাহলে তুমি কেন তোমার দাদাকেও বিয়ে করতে রাজী আমি।'

এ কথা বলেই লাচি খুব দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে দৌড়ে রেল ক্রসিং পেরিয়ে চলে গেলো।

'শালী!' বেলুচি দাঁতে দাঁত পিষে বললো, 'তোর উপর যদি

কুত্তা লেলিয়ে না দেই তো আমার নাম আহমদ ইয়ার খানই না।'

লাচি কথাটা শুনে ফেললো। ওখান থেকেই জোরে চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'তার আগে সমাজকে একটু জিজ্ঞেস করে নিও খান।' বলেই সে হাসতে হাসতে সব্জী মার্কেটের দিকে চলে গেলো।

বেলুচির কথাবার্তা তার কাছে বেশ মজা লাগলো। আজ সারাদিন সে বেলুচির কথাগুলো মনে করে করেই সব্জীর টুকরি মাথায় ফেরি করে ফিরবে। পঞ্চাশ বছরের পর মানুষ কেমন অদ্ভুত হয়ে যায়। সে রেসকলাল হোক, কি আহমদ ইয়ার খান। সব একই স্বভাবের। মুখে উপদেশবাণী, দৃষ্টিতে সেই লালসা, সেই উদগ্র বাসনা। বুড়ো হয়ে গেলে মানুষ কি অদ্ভুত, কি চিত্তাকর্ষক হয়ে যায়! আমি লেখাপড়া জানি না, লাচি ভাবলো, তা না হলে এদের উপর অবশ্যই একটা বই লিখতাম—'আমার গলির বুড়ো।'

সন্ধ্যায় লাচি হাসপাতালে গুলকে দেখতে গেলে এ প্রসঙ্গে গুলের সাথে কোন আলাপই করলো না সে।

আজকে বেলুচিও হাসপাতালে গুলকে দেখতে এলো না। এরপরও বেশ ক'দিন বেলুচি হাসপাতালে আসেনি।

পরে একদিন জানা গেলো, বেলুচি এখানকার ব্যবসা গুটিয়ে পুনা চলে গেছে এবং ওখানে নতুন করে ব্যবসা শুরু করেছে।

দেড়মাস পর লাচি গুলকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলো। ইতিমধ্যে যাযাবরদের তাঁবুর পেছনে সারিবদ্ধ গাছ থেকে নতুন পাতা গজাতে শুরু করেছে। নতুন পাতার ফাঁকে নরম নরম কলি উঁকি মারছে।

দুমারু নতুন কলিগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,

'দু' একদিনের মধ্যে কলি ফুল হবে। তারপর আমার জীবনে বসন্ত আসবে। আর মাত্র এক রাতের ব্যাপার, কিম্বা বড় জোর দু'রাতের ব্যাপার।'

'কলিতে আগুন লাগবে।' লাচি মুখ দিয়ে আগুনের ফুলকি উদগীরণ করতে করতে বললো, 'ফুল কোন দিন ফুটবে না। আর ফুটলেও লক লকে আগুন হয়ে তোর মুখ ঝলসে দেবে।'

দুমারু জোরে হেসে উঠলো।

লাচি ওখান থেকে পালিয়ে এলো। এসব সুন্দর সুন্দর ফুটন্ত কলিগুলো নবযৌবন হয়ে যেন তাকে গ্রাস করার জন্য হা করে আছে।

রাতে ওরা দু'জন আবার পুরনো ব্রীজে এসে দাঁড়ালো।

লাচি আর গুল।

আজ আকাশ বড় অন্ধকার। তাদের মনের আকাশেও একরাশ অন্ধকার। থেকে থেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তাদের মনের আকাশে ছিটে-ফোটা আলোও নেই।

গুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'এখন তুমি কি করবে?'

লাচি সোজাসুজি বলে ফেললো, 'আমি হেরে গেছি। ওয়াদা ওয়াদাই।'

'এটা তো বেঈমানীর ওয়াদা, বদচরিত্রের ওয়াদা লাচি। তুমি তা পূরণ করতে পারবে না।'

'যাযাবর মেয়ে কথা দিয়ে কথা ফিরায় না।'

লাচি মাথা নত করে জবাব দিলো। চোখে অশ্রু টলমল করতে লাগলো তার।

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে?' গুলের কণ্ঠে একরাশ আশা। বললো, 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে লাচি? পৃথিবীটা অনেক বড়। আমরা অন্য কোন শহরে গিয়ে আশ্রয় নেবো। একটা ছোট্ট ঘর বানাবো।'

'ঘর—?'

লাচি আস্তে আস্তে ফোঁপাতে লাগলো।

গুল তাকে নিজের দু'বাহুতে নিয়ে নিলো।

'হ্যাঁ, এই তো আমার ঘর।' লাচি চোখ মুদে আপন মনে বলে উঠলো, 'এই দু'বাহুর ভেতরেই তো আমার ঘর। এখানেই শান্তি, এখানেই আরাম। এখানেই আমার ভবিষ্যৎ, এখানেই ফুল ফোটে, এখানেই কেউ সকাল-সন্ধ্যা কারো প্রতীক্ষায় থাকে।'

'গুল, গুল, আমি মরে যাবো তবু নিজের ওয়াদা ভাঙতে পারবো না।'

এক সময় হঠাৎ লাচি ওর বাহু বন্ধন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো। এবং ব্রীজের রেলিংয়ে ঝুকে পড়ে কাঁদতে লাগলো। তার চোখ থেকে অশ্রুর ফোঁটা পড়তে লাগলো টপ টপ করে নীচে ইস্পাতের পাতের উপর। কিন্তু অশ্রু কি কোন দিন ইস্পাতকে গলাতে পেরেছে!

গুলের শূন্য বাহু দু'টি ঝুলে পড়লো। এবং অস্থির হয়ে, অপারগ হয়ে ব্রীজের রেলিংয়ে আঘাত করতে করতে বললো, 'তু' একটা ফালতু বেকার, কেন এই পুরনো ব্রীজটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে! এটা কোথাও যায় না, কারো সাথে কাউকে মিলায় না। নির্দয় ব্রীজটা ভেঙ্গে পড়ে না কেন?'

আঘাত খেয়ে রেলিংয়ের জোড়ায় জোড়ায় ঝন ঝন করে উঠলো। এবং অনেকক্ষন পর্যন্ত শব্দটা বাতাসে উড়ে বেড়ালো। যেন ওদের দু'জনের উপর কেউ হেসে খুন হচ্ছে।

'এই ব্রীজটা আমাদের প্রেমের মতোই, যেটা কোথাও যায় না।' মনের গভীর থেকে কথাটা বেরুলো লাচির। এবং পরে অঝোরে কাঁদতে থাকলো।

গুল তাকে স্পর্শ করলো না। সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করালো না। ওকে কাঁদতে দিলো। তার হাত দু'টো বেকার ঝুলে থাকলো, তার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে রইলো, সে না পারছিলো কিছু ভাবতে, না পারছিলো কিছু করতে। চুপচাপ কেবল লাচির একেবারে কাছে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

ধীরে ধীরে লাচির কান্না থেমে গেলো। অশ্রু মুছে নিলো ওড়না দিয়ে। নিজের ভেজা চেহারা ভালো করে পরিকার করলো।

পরে আস্তে আস্তে মাথা নত করে, কেননা সে গুলের চোখের দিকে তাকাতে পারছিলো না।

গুলকে বললো, 'এবার আমি যাই।'

'কোথায়?'

'যেখান থেকে এসেছি, যে গোত্রে আমার জন্ম। এবং যেটা আমাদের রীতি, যে রীতি পৃথিবীর জন্মের পর থেকে চলে আসছে।'

গুল অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন আমি কোথায় যাবো? তাতো বলে যাবে।'

লাচির কণ্ঠ চিরে একটি আর্তচিৎকার বেরুতে চাইলো। কিন্তু অনেক কষ্টে সে চিৎকার রোধ করলো। গলার ভেতরেই তা আটকে ফেললো।

কত আশা-আকাংখা, কত আবেগ-অনুভূতিকে হত্যা করতে হয়, তারপর গিয়ে হয়তো একটা ওয়াদা পূরণ হয়।

সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

আকাশ অন্ধকার, মাটি অন্ধকার, বৃক্ষরাজি কালো, ইয়ার্ড নিথর, সিগন্যালের বাতিগুলো কাঁচের নকল চোখের মতো তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'এসো, শেষ বারের মতো আমাকে আদর করো।'

লাচি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো।

ওরা দু'জন পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হলো।

কে একজন যেন তাদের কাছে এসে গলা খাঁকারি দিলো। গুল লাচিকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত না করেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, রামু দাঁড়িয়ে।

রামু বললো, 'ষ্টেশনে তোমাদের দু'জনকে ডাকছে।'

থার্ডক্লাসের খালি ইয়ার্ডের বাইরে পায়খানার কাছেই প্ল্যাটফরমে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। এতো লোক কোত্থেকে এলো?

গুল মনে মনে বললো। এখন রাত তিনটা বাজে। এতো রাতে কোন গাড়ীও আসে না, কিম্বা যায় না। ষ্টেশন মাষ্টার তার কোয়ার্টারে চলে গেছেন। এসিষ্টেন্ট ষ্টেশন মাষ্টারও নিজের কামরায় একখানা চেয়ারের সঙ্গে আরেকখানা চেয়ার লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন হয়তো। তা এতো লোক এখানে কি করছে?

কিন্তু এদের মধ্যে কোন যাত্রী নেই। সবাই দিনরাত রেলওয়েতে কাজ করে। কেউ কুলী, কেউ ইয়ার্ডম্যান, কেউ পয়েন্টসম্যান, কেউ মিস্ত্রী, কেউ কেউ ঘণ্টা বাজায়, কেউ পানি খাওয়ায়।

রামু বললো, 'এরা সবাই তোমাদের ঘটনা শুনেছে। তোমাদের উপকার করতে চায় এরা।'

মাতাদীন ষ্টেশনে যাত্রীদের পানি খাওয়ায়, সে নিজের কোমরবন্ধ থেকে তিনখানা নোট বের করলো। একখানা পাঁচ টাকার নোট, বাকী দু'খানা এক টাকার। পরে পকেট থেকে আরো একটা আধুলী বের করলো। মোট সাড়ে সাত টাকা সে লাচির হাতে তুলে দিলো।

আধবয়সী দাউদ নিজের জটপাকানো দাঁড়ী চুলকোতে চুলকোতে পকেটে হাত দিলো। এবং পঁচিশটা টাকা বের করে লাচির হাতে দিয়ে দিলো। কিন্তু মুখে কিছুই বললো না, স্রেফ মাথা নত করে পেছনের দিকে সরে দাঁড়ালো।

কালো ভুজঙ্গ বিপিন মিস্ত্রী নিজের সাদা সাদা দাঁত বের করে সামনে এগিয়ে এলো। সেও লাচির হাতে চল্লিশটি টাকা গুঁজে দিলো।

ডি. সুজা ষ্টেশনে ঘণ্টা বাজায়। সামনে এসে সেও দশ টাকা ন'আনা বের করে দিলো।

এক বুড়ো কুলী, মাথায় ইয়া বড় পাগড়া। তার পীলা উর্দির উপর তিনশ নম্বরের পিতলের চাক্‌তি এখনো চক চক করছে। আস্তে আস্তে কুলী এগিয়ে এলো। এবং বললো, 'আমরা সব কুলী মিলে চাঁদা তুলে একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা যোগাড় করেছি।' বুড়ো কুলী সব টাকা লাচির ওড়নায় ঢেলে দিলো।

দু'চার পাঁচজন করে আরো লোকজন এসে জড়ো হয়ে গেলো। লাচির ওড়না টাকা আর খুচরো পয়সায় ভারী হতে লাগলো। আর ওরাও কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করতে থাকলো।

তারপর সবাই আপন আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলো। কেউ কিছু বললো না।

স্রেফ রামু সামনে গিয়ে বললো, 'আমরা গরীব মানুষ। আমরা থাকতে কেউ তোর ইজ্জত নিতে পারবে না। যা, তোর সর্দারকে এ টাকা দিয়ে আয়।'

লাচির চোখ ফেটে কেবল অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এক সময় হঠাৎ তার চোখ খুশীর আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। লাচি ছুটে এসে রামুকে চুমু খেতে লাগলো, দাউদকেও, বুড়ো কুলী-কেও। তারপর খুশীতে নাচতে নাচতে সবাইকে দোয়া করতে লাগলো।

কেমন হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, কেমন আলোকিত দৃষ্টি! গুল অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকাতে লাগলো।

এদের মধ্যে কেউ ফেরেশ্‌তা নয়, সবাই মানুষ—দোষ-ত্রুটিতে ভরা। কিন্তু এতো দীপ্তি কোথা থেকে এলো, যে দীপ্তি তাদের শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণু থেকে ফুটে বেরুচ্ছে!

কে বলে আকাশ অন্ধকার?

কে বলে মাটি বন্ধ্যা?

কে বলে এসব গাছ কোথাও যায় না?

এসব সিগন্যাল এমনি শুধু শুধু আলো ছড়ায়?

বাতাসে এ কিসের সৌরভ? কানে এ কিসের রাগিনী?

কলি যতো ইচ্ছে হাসো।

ফুল যতো ইচ্ছে ফুটো।

বসন্ত তাড়াতাড়ি এসো।

আজ মানুষ তার কর্জ শোধ করে দিয়েছে।

বুড়ো কুলী অশ্রু মুছলো। সামনে এগিয়ে লাচির হাত গুলের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'ওকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো।'

গুল আর লাচি পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো।

এখন গাছগুলোকে বেশ পরিষ্কার আর সোজা দেখা যেতে লাগলো। গাছগুলো পেরুলে যে টিলা চোখে পড়ে, এখন দেখতে মনে হচ্ছে যেন আলোর মিনারের মতো উঁচু। যেন তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। লোহালক্কড়ের ওপারে যাযাবরদের চারপাশে যেন আলোর বৃত্ত তৈরী হয়ে আছে। তাঁবুর ওপারে গাছের সারিতে কলিগুলো বুঝি ঘুমিয়ে আছে।

গুল একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিলো এবং দু'টি হাত সামনে প্রসারিত করে বললো, 'খোদা, কাল যেন বসন্ত এসে পড়ে।'

গুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লাচি প্রথমে আপন তাঁবুর দিকে যেতে থাকলো। পরে কি মনে করে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো। এবং দৌড়ে দুমারুর তাঁবুর কাছে এলো। জোরে জোরে দুমারুকে ডাকতে লাগলো, 'দুমারু!—দুমারু!'

কিন্তু দুমারুর কোন জবাব এলো না।

লাচি পর্দা সরিয়ে দেখলো, তাঁবুর ভেতরে দুমারু নেই। স্রেফ জামাঁ শুয়ে আছে। লাচি পা দিয়ে ঠোকর মেরে জামাঁকে জাগিয়ে তুললো। জামাঁ হড় বড় করে উঠে বসলো। সামনে লাচিকে দেখে বড় অবাক হয়ে বললো, 'কি হলো, এ সময়—তুমি এখানে?'

'দুমারু কোথায়?' লাচি উৎফুল্ল চিত্তে জিজ্ঞেস করলো।

'সন্ধ্যার পর থেকে গায়েব।' জামাঁ চোখ মলতে মলতে বললো, 'কি দরকার?'

'কোথায় গেছে?' লাচি তার কথার কোন জবাব না দিয়েই আবার জিজ্ঞেস করলো।

'প্লাষ্টিক কারখানার মালিক শেঠজি ডেকেছে। সন্ধ্যার দিকেই চলে গেছে, এখনো আসেনি।'

আপন মনে গুন গুন করতে করতে লাচি ফিরে এলো। টিলার পেছনে চলে গেলো, যেখানে টিলার একরাশ অন্ধকার ছায়ায় গুল

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

'টাকা দিয়ে এসেছো?' গুল বড় অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করলো।

লাচি ভরা আঁচল দেখিয়ে বললো, 'হতভাগাকে পেলাম না, কাল সকালেই দেবো।'

'তোমার সাথে আবার কবে দেখা হবে?'

'সকালে কর্জগুলো শোধ করেই আমি তোমার কাছে চলে আসবো। সেই পুরনো ব্রীজের উপর তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো।'

'ঠিক আছে।'

গুল নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নিলো।

এবার লাচি ধীরে ধীরে আপন তাঁবুতে গিয়ে প্রবেশ করলো। মামনে তখন সামান্য পাশ ফিয়ে শুয়ে আবার ঘুমে অচেতন হয়ে গেলো।

লাচি ভেতরে প্রবেশ করেই চারদিকে গভীরভাবে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। তারপর একটা মাটির কুঁজোতে পুরো খুচরো পয়সা, নোট রেখে মাটির ভেতর পুঁতে রাখলো। তার উপর চাটাই বিছিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

অনেকদিন পর তার চোখে শৈশবের প্রগাঢ় ঘুম নামলো।

সকালে মা তাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। তা না হলে কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে থাকতো কে জানে।

'উঠ হতচ্ছাড়ি, লাকড়ি কুড়িয়ে নিয়ে আয়। আজ রান্নাবান্না করবি না নাকি! সূর্য মাথার উপর উঠে গেছে।'

লাচি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। এবং বাইরে চলে গেলো।

তারপর রেলওয়ের ইয়ার্ডের এখানে ওখানে পড়ে থাকা ঘাস, লতাপাতা, কিছু লাকড়ি, ঘুটে ইত্যাদি জড়ো করে তাঁবুতে ফিরে এলো। এবং মা আর মামনের জন্য চা তৈরী করলো।

এ সময় তাঁবুর মাঝখানে খোলা জায়গায় সব যাযাবর একত্র হয়ে দাফ বাজাতে লাগলো আর খুশীর গান গাইতে লাগলো।

লাচি টাকা ভর্তি কুঁজো ছেড়ে ছুটলো।

আকাশ পরিষ্কার, নিদাগ। গাছের ডালে ডালে লাল ফুল ফুটে রয়েছে। যেন হাজার হাজার সূর্য গাছের ডালে ডালে নেমে এসেছে। বসন্তের একি সমারোহ।

লাচি হাসিখুশী চেহারা নিয়ে লাল লাল ফুলগুলোকে দেখতে লাগলো। আজ তার বিয়ে হবে। আজ সে গুলের ঘরে যাবে। খুশীর চোটে সে নাচতে লাগলো। নাচতে নাচতে যাযাবরদের মাঝখানে দাঁড়ালো।

এ সময় হঠাৎ দুমারুর কালো দুর্বল হাত গিয়ে পড়লো লাচির হাতে। সে নাচতে নাচতে হঠাৎ থেমে গেলো।

'আজ বসন্তোৎসব।' দুমারু খুশী মনে বললো।

'হ্যাঁ, আজ বসন্তোৎসব।' লাচি আনন্দিত হয়ে বললো।

'আজ তোমার বিয়ে হবে।' দুমারু আবারো খুশীতে চিৎকার করে বললো।

'হাঁ, আজ আমার বিয়ে হবে।' লাচি খুবই আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো।

'আমার সাথে।'

'তোর সাথে নয়, আমার গুলের সাথে।'

দুমারু চিৎকার দিয়ে বললো, 'নিজের ওয়াদা ভুলে গেছিস ডাইনী!'

'যাযাবর মেয়ে কোনদিন নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করে না।'

'তাহলে বের কর আমার টাকা! ভাইয়েরা, পঞ্চায়েত বসাও। এক্ষুণি পঞ্চায়েত বসাও। আমার কিছু অভিযোগ আছে, পেশ করছি।'

সব লোকজন মাটিতে বসে পড়লো।

সর্দার দুমারু বললো, 'এই মেয়েটিকে তার বাবা সাড়ে তিনশ টাকার বিনিময়ে আমায় কাছে হেরে গেছে। আমি তাকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে যেতে চাইলাম। এটা কি খুব অবিচার করলাম?'

'না।' সবাই মাথা নেড়ে বললো।

'মেয়েটি এলো না। বললো, আমার কাছে নাকি যাবে না। তখন তার বাবার কাছে আমি টাকা ফেরত চাইলাম; কিন্তু সে

টাকাও দিলো না। তার মার কাছে চাইলাম, সেও দিলো না। বলো, কোন অন্যায় করেছি ?'

'না—!' যাযাবররা জোরে চেঁচিয়ে বললো।

'তখন মেয়েটি আমাকে বললো, 'বসন্তের দিন আমি তোমার টাকা ফিরিয়ে দেবো।' আজ বসন্তের দিন। সে এ পর্যন্ত মাত্র আশী টাকা শোধ করেছে। সাড়ে তিনশর মধ্যে মাত্র আশী টাকা। আজ আমি তাকে বললাম, তুই আমার হয়ে যা। বলো কোন অন্যায় বলেছি ?'

'মোটেই না।' আবার সব যাযাবর এক সাথে বলে উঠলো।

দুমারু চুপ করলো আর বিজয়ীর দৃষ্টিতে লাচিকে দেখতে থাকলো।

লাচি দৃঢ়স্বরে বললো, 'আমি তার টাকা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু রাতে সে তাঁবুতে ছিলো না। প্লাষ্টিক কারখানার মালিকের কাছে গিয়েছিলো নিজের ভাবী-স্ত্রীকে বিক্রি করার জন্য।'

'মিথ্যা কথা, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।' দুমারু জোরে চেঁচিয়ে উঠলো।

লাচি জোর দিয়ে বললো, 'চেঁচামেচি করার তো কোন দরকার নেই। আমি এক্ষুণি পুরো পঞ্চায়েতের সামনে তোর টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

এ কথা বলেই লাচি দ্রুত নিজের তাঁবুতে ফিরে এলো।

ভেতরে যে চাটাইয়ের উপর লাচি ঘুমিয়েছিলো, সে চাটাইটা তেমনি বিছানো পড়ে আছে। লাচি তাড়াতাড়ি চাটাইটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিলো।

ঝুরঝুরে মাটির নীচে গর্ত দেখা গেলো।

কিন্তু তার ভেতরে এখন কিছুই নেই। যেখানে মাটি চাপা দিয়ে কুঁজো রেখেছিলো, সেখানে এখন কিছুই নেই। না টাকার নোট, না মাটির কুঁজো, জায়গাটা খালি।

লাচি বাইরে ছুটে এলো। এবং চিৎকার করে বললো, 'আমার টাকা নিয়েছে কে ?'

সবাই নীরব।

যাযাবরের দল অবাক হয়ে লাচিকে দেখতে থাকলো।

লাচি ফিরে এসেই মার জামা চেপে ধরলো, 'বল মা, আমার

টাকা কোথায়?' মা দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলো, 'আমি নেইনি।'

মার চোখে সত্য উঁকি মারছে যেন। লাচি ওখান থেকে ফিরে চাচা মামনেকে ধরলো। চিৎকার দিয়ে বললো, 'আমার টাকা ফিরিয়ে দে বদমাশ।'

মামনে জোরে জোরে হাসতে লাগলো। বললো, 'ও মিথ্যেবাদী, এখন টালবাহানা করছে।'

'মিথ্যুক!—ধোকাবাজ!—প্রতারক!'—যাযাবররা সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, 'আজ ওকে দুমারুর কনে হতে হবে।'

'এসো এসো, জামাঁ, রাসি, সুন্নিয়া এসো, ওকে কনে বানাও।'

যাযাবরদের সবাই খুশীতে লাচির চারপাশে নাচতে লাগলো।

গুল পুরনো ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর অবাক হয়ে দেখছে, যাযাবররা সবাই তাঁবুর বাইরে নাচছে, গান গাইছে এবং জোরে জোরে দাফ্ বাজাচ্ছে। আর লাচি ওদের সবার মাঝখানে কনের সাজে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা সবাই ওকে বার বার কিছু বলার জন্য বলছে।

গুল দ্রুত ব্রীজের উপর থেকে নেমে তাঁবুর মাঝখানে চলে এলো এবং লাচির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো।

লাচির মা তখন রূপোর হাতলঅলা একখানা খঞ্জর বের করে লাচির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, 'এবার তো শেষ হলো—সব ঝগড়া শেষ—তুই হেরে গেছিস—এখন তোকে কনের নাচ নাচতে হবে।'

এ সময় গুল লাচির একেবারে সামনে এলো। ওকে দেখে যাযাবররা একটু একটু করে পেছনে সরে গেলো। আর কোণা চোখে ওকে দেখতে লাগলো। তবে সবাই নীরব নিশ্চুপ। না বাজছে কোন দাফ, না শোনা যাচ্ছে কোন রাগ। মাটি পর্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে যেন।

'লাচি!'

লাচি গুলকে এক নজর দেখলো। পরে মাথা নত করে ফেললো।

'লাচি, চল আমার সঙ্গে। আমি তোকে নিতে এসেছি।' গুল নির্ভীকস্বরে বললো।

লাচি তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলো।

গুল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'লাচি, তুমি কনের পোশাক পরেছো?'

'হ্যাঁ।'

'কালকের প্রতিজ্ঞার কথা মনে নেই তোমার?'

'মনে আছে। আমি বলেছিলাম, কাল আমি কনে সাজবো।'

'কিন্তু সে তো আমার সাথে গিয়েই কনে সাজার কথা ছিলো!'

লাচি আবারো ঝুকে পড়লো। যেন তার উপর কয়েক মণ ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সে আস্তে করে বললো, 'গুল! টাকা-গুলো চুরি হয়ে গেছে। আমি কর্জ শোধ করতে পারিনি।'

'চুরি হয়ে গেছে?' গুল হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠলো। 'চুরি হয়ে গেছে?—না না, তুমি মিথ্যা বলছো। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো।'

লাচি মাথা নত করে গুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো।

গুলের বড্ড রাগ ধরে গেলো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে কাঁপতে লাগলো।

'আমি জানি, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি সেই টাকাগুলোও দুমাক্রকে দিয়ে দিয়েছো। আর এখন তুমি ওকে বিয়ে করতে যাচ্ছো। আমার বাবা ঠিকই বলতো—যাযাবর মেয়েরা সব সময়ই অকৃতজ্ঞ। ওদের বিশ্বাস করো না। আমার বাবা ঠিকই বলতো—ওরা আওয়ারা ধোকাবাজ। ওরা ভদ্রলোকদের জালে ফাঁসিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেয়।'

লাচি টলটলায়মান অশ্রু নিয়ে একবার মাত্র গুলকে দেখলো। পরে মাথা নত করে ফেললো।

গুল লাচির গালে একটা জোর-থাপ্পড় মারতে মারতে কোন রকমে নিজেকে নিজে সামলে নিলো। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখতে থাকলো। পরে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগলো। এবং ক্রমে ক্রমে মাথা নত করে টিলার বাইরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকলো।

লাচি আস্তে বললো, 'খঞ্জরটা এবার আমাকে দে মা। আমি নাচ নাচবো। দাফ্ বেজে উঠলো। ঘুঙুর ছন ছনাতে লাগলো। কনের সাথে সাথে সারা শরীর সাপের মতো মোচড় দিয়ে উঠলো। চেহারা চকচক করতে লাগলো। গানের আওয়াজ ক্রমশঃ চড়তে শুরু করলো। পা জোড়া দ্রুত নড়তে লাগলো। হাতের গতিও বেড়ে গেলো। লয় আস্তে আস্তে দ্রুত হতে থাকলো।

নাচের তাল প্রতিটি মুহূর্তে বাড়তে থাকলো। যাযাবররা নাচতে নাচতে বন্যপশুর মতো চিৎকার দিতে লাগলো।

নাচের তালে তালে লাচি দুমারুর কাছে আসছে। এবং রীতি অনুযায়ী খঞ্জর নীচু করে দুমারুর পা স্পর্শ করে আবার ফিরে যাচ্ছে। এমন ফুর্তির নাচ, এমন দ্রুত নাচ, এমন বিপজ্জনক আর শৈল্পিক নাচ লাচি আর কোনদিন নাচেনি।

নাচতে নাচতে সে যেন আপন দেশে, আপন গোত্রে, নিজের কিংবদন্তীর রাজ্যে ফিরে এসেছে।

কোন এক সময় সে যে অন্য কিছু ভেবেছিলো, তা যেন ভুলে গেছে লাচি।

কোন এক সময় তার মনও যে অন্য পথে পা বাড়িয়েছিলো তাও বুঝি ভুলে গেছে লাচি।

কোন এক সময় সে অন্য এক স্বপ্নও যে দেখেছিলো, তাও বুঝি লাচি ভুলে গেছে।

এখন তার চোখেও সেই উদ্ধত দৃষ্টি যে দৃষ্টি প্রতিটি যাযাবর মেয়ের চোখে দেখা যায়। এবং তার নাচও তেমনি ঝড়ো আর বন্য।

সাগরের ঢেউয়ের মতো আঘাত করতে করতে —

বিষাক্ত সাপের মত মোচড় খেতে খেতে—

যাবতীয় সভ্যতার প্রতি বিদ্রোহ করতে করতে—

সবকিছুকে ভেঙ্গে চুরমার করতে করতে—

লাচি অচেতনভাবে আপন নাচে বিভোর। আর যাযাবর মেয়েরাও ধুলো উড়াতে উড়াতে লাচির চারপাশে নৃত্য করছে। এবং গাছের উপর সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল ফুল উঁকি মারছে আর হাসছে।

এক সময় হঠাৎ নাচের শেষ চক্কর মারতে মারতে লাচি দুমারুর সামনে চলে এলো। এবং রীতি অনুযায়ী নিজের দু'টি হাত সামনে প্রসারিত করে দিলো যাতে দুমারু তাকে আপন বুকে তুলে নিতে পারে।

দুমারু সামনে এগিয়ে এসে নৃত্যরতা লাচিকে নিজের বুকে নিয়ে নিলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই লাচি আস্ত খঞ্জরটা দুমারুর বুকে বিঁধিয়ে দিলো।

গুল গলির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

সামনে দরোজার উপরই দাউদের বউ দাঁড়িয়ে।

গুল শান-পাথরে একখানা ছোরা শান দিচ্ছে। আর বার বার ঘূর্ণায়মান চরকিটাকে পা দিয়ে আরো জোরে ঘুরাচ্ছে। শান-পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে ছোরাটা একরকমের খস খস আওয়াজ তুলছে। কখনো কখনো শান-পাথর আর লোহার ঘর্ষণে ছোট অগ্নিকণা ছুটছে এদিক ওদিক। শান-পাথর দ্রুত ঘুরতেই থাকলো।

দাউদের বউ গুলকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'লাচির সাজা হয়ে গেছে?'

গুল চরকির উপর ঝুকে পড়লো। যেন চরকির কোন ত্রুটি পরীক্ষা করে দেখছে সে। পরে আস্তে বললো ঃ

'হ্যাঁ! আদালত তাকে তিন বছরের সাজা দিয়েছে।'

দাউদের বউ তার প্রতি সহানুভূতিমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো ঃ

'এখন তুমি কি করবে?'

গুল তেমনি চরকির দিকে তাকিয়ে বললো ঃ

'আমি তার জন্য প্রতীক্ষা করবো।'

বলেই সে আবার চরকি ঘুরাতে লাগলো। এবং ছোরা শান দেয়ায় মনোযোগ দিলো। এক সময় হঠাৎ সে ছোরার অন্য দিকেও শান দিতে শুরু করে দিলো।

'আরে, একি করছো?'

দাউদের বউ আশ্চর্য হয়ে বললো ঃ

'তুমি তো আগে কেবল ছোরার একদিকেই শান দিতে!'

গুল মৃদুস্বরে বললো ঃ

'আম্মা! এই পৃথিবীটা বড় নির্দয়। এখানে এখন ছোরার দু'দিকেই শান দিতে হয়।'

হাজী আবদুস সালাম আর মীর চান্দানী পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তারা দু'জনে মিলে শহরে একটা ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন। সেই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তারা দু'জনেই মানুষকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছিলেন। শেষে উভয়ে একদিন ধরা পড়লেন। এবং তারই সাজা এখন ভোগ করছেন।

তবে তারা এমন সাবধানে কাজটা করেছিলেন যে, সাজা পাওয়ার পরও পুলিশ তাদের টাকা-পয়সার কোন হদিস পায়নি। প্রায় সতের লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন তারা। এতোগুলো টাকা কেউ কি এমন সহজে ছেড়ে দেয়! চাই কি বছরখানেকের জেলও হয়ে যাক না। এজন্য তারা দু'জন জেলে বড় ফুর্তিতে আছেন। আর টাকার জোরে মনে যা চায় তাই করেন।

এসিষ্টেন্ট জেলারকে তারা বন্ধু বানিয়ে ফেলেছেন। ওয়ার্ডারও

তাদের হাতের মুঠোয়। এজন্য দু'বন্ধু জেলে এসেও এমন শান-শওকতে দিন কাটাতে লাগলেন, যেন তারা জেলে নয় বরং মাইকেল রোডের কোন ফ্যাশানেবল ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন। তাদের খাবার দাবারও শহরের নামকরা হোটেলগুলো থেকে আসে। ষ্টেট এক্সপ্রেস সিগারেটের নীচে সিগারেটই খান না তারা।

রেসের মাঠে যাবার জন্য মন চাইলে জেল সুপারেন্টেণ্ড-এর চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারা রেসের মাঠেও চলে যান। বার কয়েক তারা দিলদার রোডে গিয়ে রেণ্ডীর গানও শুনে এসেছেন। এ সমস্ত জায়গায় যাতায়াতের ব্যাপারে তাদের সাথে বেশ গাট্টাগোট্টা কিসিমের দু'জন ওয়ার্ডার সব সময় থাকে।

তাদের সমস্ত টাকা-পয়সা যেহেতু নিরাপদ স্থানে গচ্ছিত আছে, সুতরাং তারা এখন আর জেল থেকে পালিয়ে যাবার কথা চিন্তাও করেন না। এ কারণেই বুঝি এসিষ্টেণ্ট জেলারও তাদের ব্যাপারে সব আইনকানুন একটু শিথিল করে দিয়েছেন।

এসিষ্টেণ্ট জেলার বেশ লেখাপড়া জানা লোক। প্রথম জীবনে একটি কলেজে সমাজতত্ত্বের লেকচারার ছিলেন। বেতন ছিলো সাড়ে তিনশ টাকা। কিন্তু খরচ একটু বেশী ছিলো বলে সব সময় টানাটানি যেতো। ক্লাসে ছেলেদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন, যেন তিনি অধ্যাপক নন, থানার দারোগা। তাই ছেলেরা সব সময় তাকে একটু ভয় করে চলতো। দু'তিনবার তার বিরুদ্ধে কলেজে ধর্মঘটও হয়েছে।

তখন যুগটা ছিলো ইংরেজদের। তিনি ছিলেন সরকারী কলেজের লেকচারার। আর সে কলেজের প্রিন্সিপ্যালও ছিলেন ইংরেজ। ইংরেজদের যুগে কোন ধর্মঘট হলে তার পেছনে কোন বিপ্লবীর হাত আছে মনে করা হতো। সে সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করলেন কলেজের লেকচারার কালীচরণ। ইংরেজ প্রিন্সিপ্যালের কাছে বদলীর দরখাস্ত করে বসলেন তিনি। এবং প্রিন্সিপ্যালের সুপারিশে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে জেল ডিপার্টমেণ্টে চলে এলেন। কেন না সে আমলে জেলের প্রাদেশিক ইনচার্জ ছিলেন তারই একজন ঘনিষ্ঠ ইংরেজ বন্ধু।

জেল ডিপার্টমেণ্ট কালীচরণের খুব পছন্দ হলো। কারণ তার মন মেজাজের সাথে এ চাকরীটারও বেশ মিল আছে। তাছাড়া এখানে ডিম, বিভিন্ন সব্জী, মাংস, দুধ, চাকর-বাকর সবকিছু বিনে পয়সায় পাওয়া যায়। আর ধনী কয়েদীদের কিছু সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে তিনি মাসে একটা নির্দিষ্ট অংকও বাগিয়ে নেন। কলেজে ফালতু কয়েকটা টিউশনী ছাড়া আর কিই বা পেতেন তিনি! এখানে তিনি খুবই সুখী, যেন আপন লোকজনদের কাছে ফিরে এসেছেন।

তবে এটাও ঠিক যে, বার কয়েক তাকে চাকুরী থেকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। আবার প্রমোশনও হয়েছে অনেক। কিন্তু তাতে কি, এ সবকিছু হচ্ছে যুগের চড়াই-উৎরাই। পর্বত প্রমাণ ঢেউ মানুষকে সামনের দিকে যেমন নিয়ে যায়, তেমনি ধাক্কা মেরে পেছনেও ফেলে দেয়। যুগ হচ্ছে একটা সমুদ্র। এবং এর মধ্যেই আমাদের থাকতে হয়। এখন সে সমুদ্র যদি আমাদের ডুবিয়ে মারে, তাতে দুঃখ কিসের?

কালীচরণকে এখন স্রেফ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় বসের ব্যাপারে। অর্থাৎ জেল সুপারেণ্টেণ্ডের সামনে তিনি কর্তব্য-কর্মে খুবই মনোযোগী তা প্রমাণ করেন।

জেল সুপারেণ্টেণ্ডও বেশ শিক্ষিত। তিনি যদি জেলার না হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই একজন সাহিত্যিক হতেন, কবি হতেন, সঙ্গীত শিল্পী হতেন। কিম্বা নিদেন পক্ষে কোন দেশপ্রেমিক দলের নেতা হতেন। অর্থাৎ তিনি এমন কিছু অবশ্যই হতেন, যেখানে তিনি নিজের মনের কথা বলার, শুনাবার এবং কার্যে পরিণত করাবার একটা মাধ্যম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। তার মনটা এক অদ্ভুত কোমলতা আর উদারতায় ভরা। তিনি মানুষের জন্য কিছু করতে চান। তার মনটাও বড় অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ। তিনি মানুষের সেবা করতে চান এবং নিজেকে সৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান

করতে চান।

শৈশবকাল থেকেই চিত্রশিল্পের প্রতি তার বড় ঝোঁক ছিলো। কিন্তু তার পিতা রায় বাহাদুর শ্রীগঙ্গা সাহা জেল ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল ছিলেন। সেই হিসেবে পুরো ডিপার্টমেন্টটাই ছিলো তাদের নিজস্ব। তখন যুগটা ছিলো ইংরেজের। আর রায় বাহাদুরকে তখন ইংরেজ সরকারের অতি আপন জনদের একজন মনে করা হতো। এজন্যই তিনি নিজের ছেলে খুব চান্দকে জেল ডিপার্টমেন্টে লাগিয়ে দেয়াটাই সবচে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।

খুব চান্দের বড় ইচ্ছে ছিলো প্যারি গিয়ে চিত্রশিল্পের উপর পড়া-লেখা করবেন। কিন্তু রায় বাহাদুরের সামনে তার কোন প্রচেষ্টাই ফলবতী হলো না। সুতরাং জেল ডিপার্টমেন্টেই যোগদান করলেন খুব চান্দ। অবশ্য তিনি যদি জেদী আর স্বাধীনচেতা হতেন তাহলে অনাহারে থেকেও চিত্রশিল্প চর্চা চালু রাখতেন। কিন্তু তিনি একেবারেই ভদ্র অমায়িক মানুষ। এ কারণেই গগা (বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী) তো হতে পারেননি, তবে জেলার হয়েছেন। কিন্তু তাতে কি, তার মনের নিষ্পাপ উদারতা, হৃদয়ের কাব্যময়তা আর কাল্পনিক শিল্প চর্চার প্রভাব এখানেও না দেখিয়ে থাকতে পারেননি। তিনি কয়েদীদের সাথে বড় ভদ্র আর কোমল ব্যবহার করেন। নিজের আমলাকে অনেক প্রশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। মানুষকে বিশ্বাস করা তার মানসিকতার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিত্রশিল্প চর্চা তিনি এখনো চালু রেখেছেন।

কিন্তু আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে তিনি কিছুটা বিরূপ। কারণ এখানে মেয়েদের নলখাগড়ার মতো বিশ্রী আর পাতলা ছিপছিপে করে দেখানো হয়েছে। আর পুরুষদের দেখানো হয়েছে ঢোলের মতো মোটা। লোকশিল্পও তার অপছন্দ, যেখানে গ্রামবাসীদের ছেলেমীপনাই কেবল প্রকাশ পেয়েছে।

প্রাচীন বাঙলার বিভিন্ন ইস্কুলের ছবি তার খুব পছন্দ। ধীর, অলস আর তন্দ্রাচ্ছন্ন ছবি, ঘুমন্ত পরিবেশ, প্রকৃতি যেন নিদ্রার

ভারে আচ্ছন্ন, বাঁশের ঝাওায় আধো ঢাকা গ্রাম, এবং নদীর তীরে চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে-যাওয়া কোন সুন্দরী এমন সুন্দর, এমন নরম আর দুষ্টু চোখের অধিকারিণী যে, একবার দৃষ্টির বাণ ছুঁড়লে মানুষ ওখানেই মাটি হয়ে যাবে।

কে জানে কোন দেশে এসব নারীরা থাকে?

কি খায়?

কিছু খায়, না কেবল নিজের সৌন্দর্যকে দেখে দেখে জীবন কাটিয়ে দেয়?

সত্যিই এসব পরিপূর্ণ নারীদের খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজনটাই বা কি?

হাত-পা নাড়াচাড়া করারই বা কি প্রয়োজন?

ও তো একটি ছবি, যাকে মানুষ সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

এবং যেহেতু অধিকাংশ লোকই তাই ভাবে, সুতরাং অনেক নারীই মনে মনে একটা সোনার ফ্রেম কামনা করে।

খুব চান্দের কাছে তো সোনার ফ্রেম আছে, কিন্তু সে রকম পরিপূর্ণ নারী তিনি এখনো খুঁজে পেলেন না। এ কারণেই জীবনের পঞ্চাশটি বসন্ত অতিবাহিত করার পরও তিনি এখনো কুমার। যার দরুন তার মনের আশা-আকাঙ্খাও এখন অনেক কমে গেছে। বোধ হয় সেই পরিপূর্ণ নারী তিনি আর পাবেনও না। আর যখনি নিরাশা এসে তার মনটাকে ঘিরে ফেলে তখনি তিনি নিজের কল্পনার নারীকে ছবির মাধ্যমে কোমলতার ছাঁচে ঢালতে শুরু করে দেন।

কখনো কখনো তিনি ছবিগুলো দেখে কেঁদে ফেলেন।

এসব ছবির একটাও কি জীবন পেতে পারে না?

এই ঠোঁটজোড়া কি কিছু বলতে পারে না?

এই বাহুর বেষ্টন কি আমার দু'বাহুতে আসতে পারে না?

এই সব সারিবদ্ধ চোখের পাঁপড়ি যদি আমার কপোলে এসে পড়ে তাহলে কি হবে?

তাহলে কি হবে ভাই?

তাহলে প্রেম হবে, এসব অলৌকিকতার পর প্রেমই হয়। জবাবে এই কথাটা কোন নির্ভয় ব্যক্তিই বলতে রাজী হলো না। প্রেমের পর হয়তো বিয়ে হবে। বিয়ের পর হয়তো সন্তান হবে। সন্তান হবার পর হয়তো ঝগড়া হবে। সন্তান এবং ঝগড়ার পর, অনেক অনেক বছর, বছরের পর বছর একসাথে অতিবাহিত করার পর হয়তো সেই নারী নলখাগড়ার মতো শুকিয়ে পাতলা হয়ে যাবে, অথবা ঢোলের মতো মোটা হয়ে যাবে। এবং তার আজীবনের লালিত স্বপ্নও ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে।

সম্ভবতঃ এ জন্যই তিনি বিয়ে করেননি। তিনি শুধু পানিতে ভাসমান পদ্মই দেখতে চান, পাঁক নয়, যেখানে পদ্মের জন্ম। আর পরিণতিও নয়, যার প্রতিটি পাঁপড়ি শুকিয়ে মুচড়ে যায়।

খুব চান্দ একজন নির্ভেজাল রোমান্টিক মানুষ। প্রতিনিয়তই যিনি কল্পনার কারাগারে বন্দী থাকেন।

তার মতো আরো অনেক অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি, কোন না কোন কারাগারে বন্দী থাকেন। আর নিজেকে নিজে স্বাধীন ভাবেন।

লাচিকে প্রথমবার যখন জেল সুপারেন্টেণ্ডের কামরায় আনা হলো, তখন খুব চান্দ তাকে দেখেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন তার হৃদয়ের গুপ্ত কুঠুরিতে এতোদিন যে স্বপ্ন লালন করে আসছিলেন, আজ যেন সে স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করলো। জীবিত আর রক্তমাংসে গড়া মানবী হয়ে তার সামনে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সেই অসামান্য রূপ যৌবন, চোখের গভীরে সেই কুটিলপনা, চালচলনে সেই ছেলেমীপনা, পরিবেশ সম্পর্কে অসচেতন আর উদ্ধত লাচি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওকে গভীর ভাবে দেখতে থাকলেন। তিনি হতভম্ব হয়ে রইলেন। পরে হঠাৎ তার মনে পড়লো, এ কামরায় তিনি একা নন, তার ষ্টেনোগ্রাফার আছে, দু'জন

কেরানী আছে, ওয়ার্ডার আছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক আমলাও আছে কামরায়।

খুব চান্দ জোর করে দৃষ্টিটা লাচির চেহারা থেকে সরিয়ে তার কাগজপত্রের উপর রাখলেন। এখানেও তাকে আরেক ধাক্কা খেতে হলো।

'তুমি খুন করেছো?'

খুব চান্দ অপ্রস্তুত হয়ে লাচির দিকে তাকিয়ে বললেন।

'তা না হলে আমি এখানে আসবো কেন?'

লাচি তাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করলো।

'সোজাভাবে কথা বলো' একজন ওয়ার্ডার বলে উঠলো, 'তিনি জেল সুপারেন্টেণ্ড।'

'আচ্ছা!'

লাচি হাত ইশারায় নিতান্তই বেপরোয়াভাবে'খুব চান্দকে সালাম করলো, যেন মাথার উপর থেকে কোন পোকা সরিয়ে দিলো।

'না না, কথা বলতে দাও তাকে।'

খুব চান্দ কোমলস্বরে বললেন। তার দৃষ্টিজোড়া আবারো কাগজ-পত্রের ভেতরে ডুবে গেলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উল্টেপাল্টে কাগজ-পত্র দেখতে থাকলেন। বেশ কিছুক্ষণ তিনি লাচির চেহারার দিকে তাকাতে পারলেন না। লাচির চেহারায় তখন একরাশ পরিহাসের ছায়া ফুটে উঠেছিলো।

এই ছবি কথাও বলে। এক সময় খুব চান্দ ভাবলেন, চলা-ফেরাও করে। তবে সিনেমার মতো নয়, বাস্তব জীবনের মতোই।

এরপরও তার সারা শরীর একটা ঝাঁকুনি খেলো।

কেন?

সম্ভবতঃ এ জন্যে যে, তিনি যেভাবে আশা করেছিলেন, এ ছবি সেভাবে কথা বলছে না।

তিনি তো রবি ঠাকুরের গানের সঙ্গে তার ছবির তুলনা করতেন। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত, কিম্বা কিট্‌সের সিম্‌বার মতো হাল্কা সুরের সুমিষ্ট গানে কোন অচেনা দ্বীপকে ভরিয়ে তুলতেন।

কিন্তু এ কেমন খসখসে, এক্সপার্ট গলা এই ছবির। খুব চান্দ খুব মানসিক আঘাত পেলেন। তিনি কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন কাজকর্ম জানো?'

'বাস্কেট বানাতে পারি, চাটাই বুনতে পারি আর ...' সে থামলো।

'আর কি?' খুব চান্দ জিজ্ঞেস করলেন।

'আর সার্কাস পার্টির সব কাজ জানি। মোটা রশির উপর দিয়ে হাঁটতে পারি, জলন্ত আগুনের গোলার ভেতর দিয়ে পার হয়ে যেতে পারি। এক নিঃশ্বাসে দশবার ডিগবাজি খেতে পারি।'

কোথায় গেলো সেই ছবি? সেই পত পত করে উড়তে থাকা বাঁশের ঝাণ্ডা—, এবং নদীর তীরে ঘাড় গুঁজে আপন চিন্তায় হারিয়ে যাওয়া সেই সুন্দরী রমণী।

আরে, এ তো অবিকল সেই ছবি, অথচ কত ভিন্ন। খুব চান্দ মনে মনে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি মনে মনে যে ছবি লালন করে আসছেন, আজ এক মুহূর্তে সে ছবি ছিন্নভিন্ন হয়ে তার পায়ের কাছে লুটোপুটি খাচ্ছে।

লাচির কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'এবং পাঞ্জাও লড়তে পারি।'

লাচি হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো এবং সুপারেণ্টেণ্ডের কাছে জিজ্ঞেস করলো, 'লড়বে?'

কামরায় যতো লোকজন ছিলো সবাই হেসে উঠলো। কিন্তু পাঞ্জাবী ওয়ার্ডার দিলদার খানের বড্ড রাগ ধরে গেলো। তাছাড়া জেল সুপারেণ্টেণ্ডের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য এটাই মোক্ষম সময় মনে করে সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'সাহেবের কথা বাদ দাও, আগে আমার সাথে পাঞ্জা লড়ো।'

দিলদার খান পাঞ্জাবী। নিজের মোটা খসখসে হাত লাচির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। লাচি ভয় পেয়ে পেছনে সরে গেলো। বললো, 'তোমার হাত আমার চেয়ে অনেক তাগড়া মনে হচ্ছে।' কামরার সবাই আবার হাসতে লাগলো।

দিলদার খান ঝুকে পড়ে বিদ্রূপমাখা স্বরে বললো, 'ব্যাস! ভয় পেয়ে গেলে?'

লাচির মুখ লাল হয়ে গেলো। সামনে এগিয়ে সে দিলদার খানের পাঞ্জার উপর জোরে ঝাঁপটা মারলো। এবং আঙ্গুল দিয়ে দিলদার খানের আঙ্গুল খামচে ধরলো।

দিলদার খান হাতের উপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলো। লাচির আপাদমস্তক কুঁচকে গেলো। কিন্তু তবুও তার হাত একটুও বাঁকা হলো না।

'হারামজাদী নটিনী!'

দিলদার খান ক্রোধান্বিত হয়ে বললো। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলো।

'হারামজাদা তুই, তোর বাবা। পাঞ্জা লড়, বেশী কথা বলিস না।'

লাচিও রেগে গিয়ে বললো।

দিলদার খানের সমস্ত শক্তি লাচির হাতের উপর গিয়ে পড়লো। কিন্তু লাচিও কেবল নটিনীর প্যাঁচই শিখেনি। সে নিজের শরীরটা ঢিলা করে শক্তিটা পুরো শরীরে ছড়িয়ে দিলো। অথচ তার হাত দিলদার খানের হাতের ভেতর আটকে রাখলো শক্ত করে।

দিলদার খানের শ্যামলা চেহারা এখন রাগে কালো হতে শুরু করলো।

হঠাৎ লাচি দিলদার খানের চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগলো। এবং বললো, 'দেখ, এবার আমি পাঞ্জাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি কিন্তু।' বলেই লাচি শরীরটা বেঁকিয়ে এমন এক কাজ করে বসলো যে, হাতের এক ঝটকাতেই দিলদার খানের হাত থেকে নিজের হাতটা ছুটে গেলো।

কামরার সবাই আবার জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

দিলদার খান পাঞ্জাবী তার হাত উপরে উঠালো লাচিকে মারার জন্য। কিন্তু জেল সুপারেন্টেণ্ডের রক্তচক্ষু দেখে তার হাত ওখানেই থেমে গেলো।

'দিলদার, এসব কি বোকামী শুরু করলে?' খুব চান্দ কঠোর স্বরে বললেন।

পরে মেয়েদের ইনচার্জ জিনাবাঈকে উদ্দেশ্য করে আবার বলতে লাগলেন, 'জিনাবাঈ, ওকে নিয়ে যাও। এবং ছ'মাস অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে আলাদা করে রেখো। বড় সাংঘাতিক মেয়ে মনে হচ্ছে।'

'আমি আলাদা থাকবো না, আমি আলাদা থাকবো না।' হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলো লাচি।

জিনাবাঈ ভয় পেয়ে পেছনে সরে গেলো।

খুব চান্দের আদেশে দু'তিনজন ওয়ার্ডার মিলে লাচিকে ঘিরে ধরলো। এবং মেয়েদের সার্কেলে তাকে পৌঁছিয়ে দিলো, যেটা জেলখানার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত।

সারারাত খুব চান্দের ঘুম হয়নি। অনেকক্ষণ ধরে তিনি নিজের সুন্দর ফ্ল্যাটের ডিমলাইটের আলোয় দেয়ালে টাঙ্গানো নিজেরই ছবিগুলো দেখছেন।

ছবিগুলোকে তিনি কত ভালোবাসেন। জেলের কঠিন পাপ-পঙ্কিলতা আর অত্যাচার অনাচারে ভরা পৃথিবীতে এই ছবিগুলোই তার একমাত্র সম্বল। ছবিগুলোই তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তার বন্ধু। এই ছবিগুলোর প্রতিটি রেখায় রেখায় জড়িয়ে আছে তার অনেক অনেক বছরের কঠোর পরিশ্রম আর প্রগাঢ় অনুরাগ।

কিন্তু এতো বছরের পরিচিত ছবিগুলোকে আজ মনে হচ্ছে যেন কত অজানা, অপরিচিত। যেন সবকিছু ভেঙ্গে গেছে—সবকিছু পড়ে গেছে—টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

তিনি তো এই ছবিগুলোকে চেনেনই না।

তিনি কি করে এই ছবি তৈরী করতে পারেন? ছবিগুলো তো সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মিথ্যা। এই ছবি তার নয়। এগুলো তো কোন বোকা শিক্ষানবীশের অর্থহীন কিছু জটিলতা আর কিছু বক্র রেখা, এর মধ্যে কি আছে? বছরের পর বছর তিনি এই ছবিগুলোকে দিয়ে কিছু বলাতে চেষ্টা করে আসছিলেন। কিন্তু এই ছবি বলবে কি করে? এ তো মরা, কল্পনার মরা লাশ। আত্মাই নেই এই

ছবির, তা বলবে কি করে ?

লাচির উপরও তার বড্ড রাগ ধরে গেলো। এক সময় তিনি অনুভব করলেন, যেন ফালতু কাজে জড়িয়ে পড়ে তিনি নিজের বয়েসটা শেষ করলেন। যেন কোন ভুল পথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এক অন্ধ কুয়োয় গিয়ে পড়েছেন।

দেয়াল থেকে এক এক করে সব ছবি নামিয়ে ফেললেন তিনি। তারপর ফ্রেম থেকে ছবিগুলো আলাদা করে এমন ভাবে ছিঁড়তে লাগলেন, যেন নিজের জীবনের পুরনো পাতাগুলোকে ছিঁড়ে ফেলছেন।

চোখ থেকে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কেননা জীবনের পাতা তো আর কাগজের পাতা নয় যে আবার লেখা যাবে।

ঠিক আছে, এখন তিনি স্রেফ জেলার হয়েই থাকবেন।

যৌবনকালে জিনাবাঈ নিজের দেহ-ব্যবসা করতো। যখন রূপ-লাবণ্য আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগলো, তখন পকেটমারের সাইড ব্যবসা শুরু করে দিলো।

অর্ধেক বয়েস যেতে না যেতেই জিনাবাঈ একজন নামকরা কুটনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলো। তার কাজ হলো সুন্দরী মেয়েদের ফাঁসানো এবং পরে তাদের বিখ্যাত বিখ্যাত দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয়া।

এ ব্যবসায় সে পয়সা প্রচুর পায়। কিন্তু বিপদও কম না। চার-ছ'বার তাকে জেলেও যেতে হয়েছে। শেষবার একটি গর্ভবতী মেয়েকে ফাঁসানো এবং তার সন্তান হত্যার অপরাধে জিনাবাঈকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

জিনাবাঈর চোখ দু'টি বেশ দয়ালু। মুখে দাঁত নেই বললেই চলে। গলার স্বরটাও বেশ মিষ্টি। জিনাবাঈ এখন বুড়ি হয়ে গেছে। তার চালচলনে এক অদ্ভুত মমতা সারাক্ষণ যেন ঝরে

পড়ে। যার দরুন জেলের সব মেয়ে কয়েদীদের মধ্যে সে খুব জনপ্রিয়। চার-ছ'বার জেল খাটার পর এখন সে এই পরিবেশের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। এখন তো এই জেলই তার ঘর, তার দেশ, তার রাজনীতি—সব কিছু।

জেলের মেয়েদের কাছে সে খুব বিখ্যাত বলে কর্তৃপক্ষও তাকে বেশ পছন্দ করে। পুরুষ কয়েদীদের মধ্যে নামকরা যে গুণ্ডা, সেও জিনাবাঈকে সমীহ করে। কারণ সে সব কাজ জানে। সে সব রকমের বেঈমানীর কাজ বিশ্বস্ততার সাথে, সততার সাথে সমাপন করতে পারে। যেটা ব্যবসার জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

কিন্তু দুঃখের কথা যে, সময় তাকে সহায়তা করলো না। এবং লেখাপড়াও শিখতে পারলো না সে। তার উপর সে একজন গরীব ভারতীয় নারী, তা না হলে জিনাবাঈর মধ্যে একজন সফল ব্যবসায়ীর সব গুণাবলী বিদ্যমান ছিলো। সে যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হতো তাহলে হয়তো একজন লাখপতিই বনে যেতো।

জিনাবাঈ বাইরের পৃথিবীর যাবতীয় খবরাখবর ভেতরে মেয়েদের কাছে এনে পৌঁছিয়ে দেয়। এ ছাড়া পুরুষ আর মেয়েদের জেলের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারিণীর ভূমিকাও পালন করে থাকে সে। চরস আর আফিংয়ের আমদানীও তার মাধ্যমেই হয়। জেলে দু'তিন জন এমন মেয়ে কয়েদীও আছে, যাদের মর্ফিয়া ইনজেকশন ছাড়া চলে না। বলা বাহুল্য এ কাজটাও জিনাবাঈর কাঁধেই ন্যস্ত।

এছাড়া লোহার গরাদের এখানে ওখানে কি প্রেম-ভালবাসা একেবারেই হয় না? জেলের মানুষগুলো কি মেয়েছেলে কামনা করে না? ওরা কি পুরুষ নয়? ওদের কি আবেগ বলতে কিছুই নেই? এবং সে আবেগে কি আগুন লাগতে পারে না? শুকনো ম্যাচের কাঠির মতো দপ করে জ্বলে উঠতে পারে না?

জীবনটাই একটা ফাঁকা বেলুনের মতো। যার একদিকে চাপ দিলে অপরদিকে ফুলে উঠে। খুব জোরে চাপ দিলে আবার ফেটে

যায়। এবং এটাও এক ধরনের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেয়ার মতো ব্যাপার। যেটা অনুধাবন করার জন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে না।

কিন্তু জিনাবাঈ নিজের কয়েদীদের উপর কোনদিনই প্রয়োজনের বেশী চাপ সৃষ্টি করে না। ব্যাস, যতটুকুন ওরা সহ্য করতে পারে তার বেশী না। কেন না যারা বুদ্ধিমান অপরাধী তারা নিজেদের পেশায়ও বড় বিশ্বস্ত। আর দশজন ভদ্র পেশার মানুষের মতো তারা চাপ সৃষ্টি করে।

ব্যাস, অন্যে যতটুকু সহ্য করতে পারে ঠিক ততটুকুই ব্ল্যাকমেল করো।

ব্যাস, অন্যে যতটুকু সইতে পারে ঠিক ততটুকুই অপমান করো।

ব্যাস যতটুকুতে তোমার কাজ হাসিল হয়, ঠিক ততটুকুই শাসন তুমি তাকে করো।

ব্যাস চুরীও করো এমনভাবে যাতে সে বেঁচে থাকতে পারে। যাতে দ্বিতীয়বার সে ঘরে চুরি করতে পারো।

অপরাধ আর রাজনীতির মধ্যে খুব একটা বেশী ব্যবধান নেই।

প্রথম ছ'মাস বড় আরামে কাটলো। গুলও প্রায় সময় তার সাথে দেখা করতে এলো। দু'বেলা খাবারও পাওয়া গেলো ভিক্ষা করা ছাড়া, চুরি করা ছাড়া, কারো কাছে অপমানিত হওয়া ছাড়া। পরিশ্রমও করতে হতো নেহাত মামুলী। যদিও তা অন্যান্য মেয়েদের জন্য খুবই কষ্টকর পরিশ্রম ছিলো।

ছ'মাস অন্যান্য কয়েদীদের কাছ থেকে আলাদা থাকতে থাকতে লাচির মনে শান্তি স্বস্তি ফিরে এসেছে। বাইরের দুর্ঘটনাপূর্ণ জীবনের চেয়ে এই জেল জীবন লাচির কাছে অনেক সুন্দর, অনেক শান্তির মনে হলো।

একদিন জীনাবাঈ লাচির কাছে এলো। এবং বললো, 'আয়, তোকে জেল সুপারেণ্টেণ্ড সাহেব ডেকেছে।'

'কেন ডেকেছে?'

'আমি কি জানি!' জিনাবাঈ হেসে বললো, 'তোর কোন লাভ-

জনক কাজ হবে হয়তো, চল।'

লাচি জিনাবাঈর সঙ্গে চললো।

খুব চান্দ তাকে স্বাগতম জানালেন।

সাতটা বেজে গেছে। অফিস টাইম শেষ। খুব চান্দ অফিস সংলগ্ন একটি কামরা নিজের ব্যক্তিগত কামরা হিসেবে ব্যবহার করেন। ওই কামরায় তিনি দিনে খাবার-দাবার খান, বিশ্রাম নেন। ওই কামরায় তিনি ছবি আঁকার যাবতীয় সরঞ্জামাদিও এনে তুলেছেন।

লাচি ঘরে ঢুকেই কাঠের ইজেলে আর একটা আনকোরা সাদা কাগজ টাঙ্গানো দেখে বড় আশ্চর্য হলো। জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি?'

'তোমার ছবি আঁকবো।' খুব চান্দ নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

'আমার ছবি?' লাচি যুগপত খুশী আর অবাক-বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলো।

খুব চান্দ মাথা নেড়ে এক কোণে পড়ে-থাকা কাপড়ের পুঁটলির দিকে ইশারা করে বললেন, 'ওখানে তোমার সব কাপড়-চোপড় রাখা আছে। জেলের পোষাকটা খুলে ওগুলো পরে নাও। এবং পরা শেষ হলেই আমাকে ডাক দিও, আমি পাশে অফিস কক্ষে বসছি।'

'আচ্ছা'। বলেই লাচি কাপড়ের পুঁটলির দিকে এগুলো। খুব চান্দ আর জিনাবাঈ কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। এবং বাইরে অফিস কক্ষে এসে বললো ঃ

'এবার তুমি যাও।'

জিনা খুব চান্দের দিকে তাকিয়ে একটা চাতুর্যের হাসি হাসলো। পরে ঝুঁকে পড়ে সালাম করে সহাস্যমুখে বিদায় নিলো।

কিছুক্ষণ পর লাচির কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'ভেতরে এসো।'

খুব চান্দ ভেতরে এলেন।

লাচি ছোট্ট একটা কাঠের টুলের উপর দাঁড়িয়ে বড় মনোহর

ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। তারপর খুব চান্দকে দেখেই বলে উঠলো, 'ব্যাস, এভাবেই ছবি তুলে নাও।'

'এভাবে তুলবো!' খুব চান্দ পেন্সিল ঠিক করে রঙ মেশানো শুরু করে দিলেন।

'কিন্তু আমি যে তোমার ছবি আঁকছি কাউকে বলো না যেন।'

'ঠিক আছে, বলবো না। কিন্তু এতে খারাপ কি, সবাই তো ফটো তোলে। একবার ষ্টেশনে এক ইংরেজ আমার ফটো তুলেছিলো। আমাকে পাঁচ টাকা বখশিশও দিয়েছিলো। অনেক লোক আমার ফটো তোলে।'

'এটা ফটো নয়।'

'তাহলে কি?'

'এটা ছবি। তুলি আর রঙ দিয়ে কাগজে তৈরী করা হয়।'

'এতে কত সময় লাগবে?'

'দশ দিনও লাগতে পারে, দশ মাসও লাগতে পারে। আবার দশ বছর লাগাটাও বিচিত্র নয়।'

'তাহলে কি দশ বছর আমি তোমাদের জেলে থাকবো?'

'না। পরে তোমার ঘরে গিয়ে ছবি আঁকবো।'

'আমার তো কোন ঘর নেই।' হঠাৎ লাচি বিষণ্ণ হয়ে গেলো। 'ঘর হতো, যদি গুলের সাথে আমার বিয়েটা হয়ে যেতো।'

'গুল? সেই যে তোমার সাথে দেখা করতে আসে, পাঠান ছেলেটা?' খুব চান্দ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ।'

'তুমি ওকে ভালবাসো?'

'জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসি। বাবু,.....একটা কথা রাখবে?' লাচি বড় আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'বলো।'

'ওকেও জেলে রেখে দাও। এখানে একটা কুঠুরি দিয়ে দাও, তোমাদের এখানে তো অনেক জায়গা আছে। আমরা দু'জন কোন রকমে ঠাঁই করে নেবো। এখানেই আমরা ঘর বানাবো।'

খুব চান্দ খুব হাসলেন। বললেন, 'পাগলী, জেলে তো অপরাধীরা আসে সাজা ভোগ করার জন্য। তোমার কাছে কি বাইরের পৃথিবী আর জেলের পৃথিবীর মধ্যে কোন পার্থক্য মনে হয় না!'

লাচি বড় বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বললো, 'বাইরের পৃথিবীটাও একটা জেলখানা বাবু। পার্থক্য শুধু ওখানে লোহার গরাদ নেই।'

লাচি খুব চান্দের দিকে মোটেই তাকাচ্ছে না। তার দৃষ্টি উপরে, একরাশ শূন্যতার দিকেই নিবদ্ধ।

খুব চান্দ চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া লাচির অসামান্য রূপলাবণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এক সময় লাচি ঘুরে তাকালে খুব চান্দও চমকে উঠে ইজেলের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। লাচি হেসে বললো, 'আরে বাবু, তুমি তো এখনো ছবি আঁকা শুরুই করোনি। কাগজ তো একেবারে আনকোরা রয়ে গেছে।'

'এতোক্ষণ ধরে তোমাকে বুঝার চেষ্টা করছিলাম আমি।'

'আমাকে বুঝার চেষ্টা! আমার মধ্যে কি আছে? আমি তো ব্যাস লাচি।'

'সেটাই তো সমস্যা!'

'কি?'

'কিছু না।' খুব চান্দ একটু তিক্তস্বরে বললেন, 'তুমি টুলের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আর নড়াচড়া করো না, কথাবার্তা বলো না।'

'সেটা তো বড় কঠিন।'

'কিন্তু তা না হলে ছবি হবে না।'

'ঠিক আছে, এবার আমি একেবারে চুপ করে থাকবো।' লাচি দু'ঠোঁটের মাঝখানে আঙ্গুল রেখে বললো। খুব চান্দ তাকে পোজ দেখিয়ে দিলেন। আর লাচি সেই পোজে কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। খুব চান্দ ইজেলে ছবি আঁকতে লাগলেন।

কয়েক মিনিট পর লাচি বললো, 'বাবু···আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

এবার খুব চান্দ তার জন্য পানি নিয়ে এলেন।

পরে আরো কয়েক মিনিট পর লাচি বললো, 'বাবু, গুল যদি কাউকে মেরে এখানে আসে, তাহলে কি তুমি তাকে তোমাদের জেলে জায়গা দেবে?'

'কাকে মেরে আসবে?'

'যাকেই হোক, এই পৃথিবীতে কত অত্যাচারী আছে।'

'কাউকে মারা দোষ, অপরাধ হয়। আর মনে করো যদি গুলের আড়াই বছর জেল না হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়?'

'তাহলে আমিও আজীবন তার সাথে জেলে থাকবো!'

'মনে করো তার ফাঁসি হয়ে গেলো?'

'ওরে বাপরে! তাহলে তো……বড় খারাপ হবে।'

লাচি চমকে উঠলো। পরে চিন্তা-ভাবনা করে বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ছবি বানাও, আমি আর কিছু বলবো না।'

আবার পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো লাচি।

খুব চান্দ শাসনের ভঙ্গীতে বললেন, 'এবার একটুও নড়াচড়া করতে পারবে না।'

বড় জোর আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে, এ সময় লাচি বলে উঠলো, 'বাবু! তুমি জেলের সবার চেয়ে বড়বাবু?'

'হ্যাঁ। আমি জেল সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট।'

'সুপরিটান?'

লাচি থেমে থেমে তার পদবী মুখস্থ করতে করতে লাগলো।

'হ্যাঁ, সুপরিটান।' খুব চান্দ খুব হাসলেন।

'সুপরিটানের বড় জেলের আর কোন বাবু নেই?' লাচি জিজ্ঞেস করলো।

'আছে। ডিপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল।'

'ডিপটি জারনেল?—তার চেয়ে বড়বাবু কে?'

'তার চেয়ে বড় জারনেল।' খুব চান্দ হেসে বললেন।

'এবং তার চেয়ে বড়বাবু কে?'

'তার চেয়ে বড় খোদা।' খুব চান্দ যেন ব্যাপারটার ওখানেই

মিটমাট করতে চাইছেন।

লাচি চুপ করে গেলো। অনেকক্ষণ চুপ থাকলো। পরে আস্তে করে বললো, 'খোদাও তো পুরুষ। এ সংসারে যত বড়বাবু আছে সবাই পুরুষ। সুতরাং সুবিচার আমি আর পাবো কোথায়?'

খুব চান্দ চমকে উঠলেন। ঘুরে লাচিকে দেখতে লাগলেন তিনি। কিন্তু লাচির চেহারায় কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না। যেন জানেই না সে কি বলেছে? স্রেফ দাফটা উঁচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো।

খুব চান্দ বেশ কিছুক্ষণ আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখতে থাকলেন। পরে ঘুরে ইজেলের বুকে তুলির আঁচড় জমাতে শুরু করলেন।

এ সময় হঠাৎ টুল থেকে নীচে নেমে এলো লাচি। খুব চান্দ ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো?'

'কিছু না। পা চুলকোচ্ছে।' এ কথা বলেই লাচি পা চুলকোতে লাগলো।

খুব চান্দ তার এই ছেলেমীপনায় হেসে ফেললেন।

লাচির মকদ্দমা ষ্টেশন ইয়ার্ড এলাকার মানুষদের জন্য নিত্য নতুন মুখরোচক খবরের জন্ম দিতে লাগলো। পুলিশের আনাগোনা, রিপোর্টারদের ইন্টারভিউ, যাযাবর গোত্রের বিভিন্ন ছবি বেশ হৈ-চৈ সৃষ্টি করলো।

যত মুখ তত কথা।

কিছু লোক লাচির সাহসিকতার প্রশংসা করতে লাগলো। কিন্তু অধিকাংশই তার বিরুদ্ধে। সে সমাজ আর গোত্রের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করেছে। সুতরাং সমাজ আর গোত্র এতো সহজে তাকে ক্ষমা করবে না।

প্লাষ্টিক মিলের মালিকের নামও জড়িয়ে পড়েছে এই মকদ্দমার সাথে। তার সাক্ষীও নেয়া হয়েছে।

প্লাষ্টিক মিলের মালিক এই এলাকার একজন মাথাভারী ব্যক্তি।

এই মকদ্দমা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তিনি নিজের পুরো প্রভাব খাটিয়ে শেষ করেছেন। শুধু তাই নয়, যে কোন রকমেই হোক, লাচি যেন এই মকদ্দমার হাত থেকে বাঁচতে না পারে তার জন্যও চেষ্টা তদবীরের অন্ত রাখেননি। যদিও লাচির সাহসিকতাপূর্ণ জবানবন্দী এবং অপরাধ স্বীকারের পর এসবের কোন প্রয়োজনই ছিলো না। এর পরও প্লাষ্টিক মিলের মালিক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন, যেন লাচির খুব কঠিন সাজা হয়।

পুরুষ শাসিত সমাজ হোক, কি পুরুষ শাসিত গোত্রই হোক, ওরা মেয়েদের সব রকমের অপরাধের উপর পর্দা ঢেকে দেয়। কিন্তু তাই বলে কোন মেয়ে বিদ্রোহী হয়ে নিজের ইজ্জত, নিজের সতীত্ব রক্ষা করার জন্য লাচির মতো জীবন পণ করে বসবে, তা তারা কোন রকমেই মানতে রাজী নয়। কারণ এতে অন্যান্য মেয়েদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

এবং হয়েছেও তাই।

এই মকদ্দমায় সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছে মেয়েরা। যুবতী মেয়েরা এখন একে একে সবাই খারাপ ধান্ধা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

এজন্যে ওদের স্বামীরাও খুব চটা।

গোত্রের সর্দারও চটা।

গোত্রের বৃদ্ধারাও চটা।

কিন্তু লাচির সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধ শতাব্দীর পুরনো শিকল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। এবং বুকের ভেতরে এতোদিন যে ঝড় তোলপাড় করছিলো, এখন প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এসে প্রতিটি যুবতী মেয়ের চেহারার উপর যেন মাথা কুটে মরছে।

এখন ওরা মোরগ চুরি করুক, চাই কয়লা চুরি করুক, টুকরি বুনুক, কি রূপোর আংটি বিক্রি করুক, কিম্বা যে কোন পরিশ্রমের কাজই করুক, আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে ইজ্জত বিক্রি করতে ওরা এখন আর রাজী নয়। ওরা এখন বরং স্বামীদের পর্যন্ত খোঁচা দিতে শুরু করে দিয়েছে, যেন তারা পরিশ্রম করতে শেখে।

তিনটি মেয়ে তো গোত্র ছেড়ে পালিয়েই গেছে। তারা শহরের গরীব অথচ পরিশ্রমী যুবকদের বিয়ে করে সুখে ঘর বেঁধেছে।

গোত্রের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়ে গেছে। ফলে ঝড়ের প্রথম তোড়েই পুরনো রীতি-নীতি ময়লা আবর্জনার মতো উড়ে গেছে। এবং নতুন বিদ্রোহের জোয়ার গোত্রকে জোর করে বিংশ শতাব্দীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এরকমই হয়। প্রতিটি মানুষের জীবনে, প্রতিটি যুগে, প্রতিটি সমাজে এরকমই হয়। অর্থাৎ ওরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায় না। সবাই আপন আপন শিকলের সাথে, আপন অভ্যাস, রীতি-নীতি আর অন্ধ ধর্মীয় এবং সামাজিক বিশ্বাসের সাথে জড়িয়ে থাকতে চায়।

কিন্তু বিদ্রোহের প্রচণ্ড শক্তি তাদের সামনের দিকে ঠেলে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে যায়। এই শক্তির কাছে ওরা কেউ-ই টিকতে পারে না। সামনে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

গোত্রের এই পরিবর্তন ষ্টেশন ইয়ার্ড এলাকার সব সমাজে রীতি-মতো ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছে। যার দরুন বিভিন্ন শক্তি একত্রিত হয়ে গোত্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো। এবং তাও নীরবে, খুব ধীরে ধীরে।

গোত্রের যুবতী মেয়েরা এই এলাকার লম্পট মানুষগুলোর জন্য একটা বিরাট অবলম্বন ছিলো। খুব সস্তা অবলম্বন।

কিন্তু গোত্রের যুবতী মেয়েদের বিদ্রোহ বিভিন্ন দালালদের রুজি রোজগারে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। ফুলের দোকানে বিক্রি কমে গেছে। রাতে ট্যাক্সীর আনাগোনা কমে গেছে বলে তাদের ধান্ধায়ও মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। এবং বেআইনী মদ্য বিক্রিও বন্ধ হয়ে গেছে।

এর সঙ্গে যদি প্লাষ্টিক মিল মালিকের শত্রুতা যোগ করা যায় তাহলে অবশ্য গোত্রের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণার আবেগ কতটুকুন তার একটা হাল্‌কা চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

ধীরে ধীরে মানুষ এখন ভাবতে শুরু করে দিয়েছে, এই গোত্রের প্রয়োজনই বা কি? আর কেনই বা এই গোত্র আমাদের এলাকায়

এভাবে অনেক বছর থেকে কেবল বংশ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে ?

এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা করার লোকের অভাব নেই। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করছে। শুধু খারাপ লোকরাই গোত্রের মেয়েদের এই রীতি পরিবর্তন করার দরুন মনে মনে দুঃখ পেয়েছে। তা না হলে অনেক ভদ্রঘরের লোকও লাচির এই মকদ্দমার পর মাঠে নেমে গেছে। এছাড়া ভদ্রঘরের মেয়েরাও গোত্রের বিরুদ্ধে তাদের স্বামীদের উস্কানি দিচ্ছে। যতদিন এই গোত্র এখানে থাকবে, তাদের স্বামীরাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে !

লাচির মকদ্দমা গোত্রের যাবতীয় ময়লা আবর্জনা প্রকাশ করে দিয়েছে। ফলে এখন ভালো-মন্দ সবাই নাকে রুমাল চেপে তাদের এই দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছে।

এরা চোর।

ডাকাত।

পাপী।

আওয়ারা কামচোর।

সমাজের দুষ্টক্ষত।

এরা আমাদের এলাকায় কেন পড়ে আছে ?

মিউনিসিপ্যালিটি কেন এদের জায়গা দিয়ে রেখেছে ?

এদের জন্য রেলওয়ের বিভিন্ন মালপত্র চুরি যাওয়ার ভয় আছে।

এদের কোন ধর্ম নেই, কোন বিশ্বাস নেই।

এরা যে কোন মুহূর্তে দেশ আর জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

যত মুখ তত কথা।

আস্তে আস্তে মকদ্দমা যতই শেষ পর্যায়ের দিকে যেতে থাকলো, গোত্রের বিরুদ্ধে মানুষের আবেগও তত জোরে বাড়তে লাগলো। নিজেদের যাবতীয় দুর্গন্ধ ঢেকে রাখার জন্য এরা সব অপরাধ যাযাবরদের উপর চাপিয়ে দিতে লাগলো।

এরা ভুলে গেছে যে, গোত্রের প্রতিটি ধান্ধাবাজ মেয়ের সাথে ভদ্র সমাজের অন্ততঃ একজন করে লোক জড়িত। কিন্তু এসব লোক-

জন খুবই ভদ্র, সংসারী, চাকুরীজীবী অথবা কোন না কোন ভদ্র পেশায় নিয়োজিত। অর্থাৎ সবাই এদের আপনজন। আর গোত্রের লোকজন পর। এজন্য সবাই নিজের লোক আর নিজের মান-ইজ্জত বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এবং গোত্রের বিরুদ্ধে এমন আস্ফালন শুরু করেছে।

প্রতিটি সমাজ আপন পাপ ঢাকার জন্য বাইরের যে কারুকে বলির পাঠা বানায়—বংশের বাইরের, সমাজের বাইরের, দেশের বাইরের, অথবা মতবাদের বাইরের যে কারুকেই।

এসব পাঠা সব সমাজের জন্য একই কাজের যোগান দেয়। এবং এই পাঠা ছাড়া কোন সোসাইটি বা সমাজই চলতে পারে না। এবার সে সমাজ চাই ক্ষয়িষ্ণু হোক, চাই কি প্রগতিশীল।

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই পাঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তারপর পাঠার জীবন নিয়ে, তার রক্ত পান করেই প্রতিটি সমাজ আবার নবজীবন লাভ করে।

(মানব ইতিহাসের এক দিক যদি শহীদানদের রক্তে সুউজ্জ্বল থাকে তো অন্য দিক পাঠার রক্তে রঞ্জিত থাকে। পার্থক্য স্রেফ, শহীদানদের কথা সবাই গর্বের সাথে স্মরণ করে, আর পাঠার কথা কেউ স্মরণই করে না। আর যদি স্মরণ করতে বাধ্যও হয়, তাহলে মাথা ঝুকিয়ে ফিস ফিস করে ওদের কথা উল্লেখ করে যায়। এ কারণেই তো মানুষ আপন শহীদানদের নাম জানে, কিন্তু আপন পাঠার নাম জানে না।

যেদিন লাচির সাজা হয়ে গেলো সেদিন এলাকারও মুখ কালো হলো। এবং মকদ্দমার পুরো বিবরণ, জজের রায় পত্রিকায় ছাপা হবার পর তো এলাকার দুর্নামও বাড়তে শুরু করে দিলো।

শুরু হলো আস্তে আস্তে বিভিন্ন কানাঘুষা।

লাচির সাজা হওয়ার দশদিন পর ট্যাক্সী ড্রাইভার হামিদে কমলা কর ড্রাইভারকে বললো, 'আজ রাতে উৎসব হবে।'

'কোথায় কমলা কর?' জিজ্ঞেস করলো।

'ষ্টেশন ইয়ার্ডের ওপারে।' বলেই হামিদে চোখ মারলো।

কমলা কর কিছু তার বুঝলো, কিছু বুঝলো না। তবে যেটুকুন বুঝলো, তাই ওর জন্য যথেষ্ট। কারণ আরো ভালো করে বুঝে নেয়ার প্রয়োজন তার পড়েনি।

'সঙ্গে কিছু নিয়ে আসবো?'

'হ্যাঁ।'

'আর?'

'আর কি, আধা বোতল মেরে আসবে, তা না হলে অনুষ্ঠানে মৌজ পাবে না।'

ফলঅলা মাধুকে পানঅলা বললো, 'আজ রাত অনুষ্ঠান হবে।'

মাধু চমকে উঠলো, 'তাই?'

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'রাত দুপুরে। যাবে?'

'হ্যাঁ, যাবো।'

মাধুর সাদা টাক উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর মাধু জিজ্ঞেস করলো, 'একা আসবো?'

'কোন বন্ধু-বান্ধব না পেলে একাই এসো। তবে লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে এলে ভালো হয়।'

'আমার দশ-বারোজন দুধ ব্যবসায়ী বন্ধু আছে, লাঠি খেলায় ওস্তাদ। যদি বলো ওদেরও নিয়ে আসি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। বড় মজা হবে।'

প্লাষ্টিক মিলের মালিক শহরের একটা বিখ্যাত আড্ডায় টেলিফোন করলো, 'চিন্তামণি, আজ সব লোকের দরকার হবে।'

চিন্তামণি সব রকমের ধান্ধা করে। চরস, আফিং, গাঁজা, কোকেন, জুয়া, নষ্ট মেয়ে মানুষ, মদ, খুন-জখম সব কিছুতেই সে সিদ্ধহস্ত। বড়ই ভদ্র, অমায়িক, বিশ্বস্ত আর ঈমানদার অপরাধী। বার কয়েক

শ্রীঘরও করে এসেছে। এজন্যই অপরাধের জগতে তার ভদ্রতা এবং ব্যবসার জগতে তার ঈমানদারীর কথা সর্বজনস্বীকৃত।

সে ফোনে বললো, 'কখন দরকার প্রভু?'

'আজ রাত দশটায়। যদি ওরা মিলের গেটে আসে তো সব রকমের নির্দেশ দেয়া যাবে।'

'ঠিক আছে প্রভু!' বলেই চিন্তামণি ফোনের রিসিভার রেখে দিলো। এবং সব ব্যবস্থা পাকা করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলো।

উৎসবের সময় আস্তে আস্তে কাছে আসতে লাগলো।

সন্ধ্যার সাথে সাথেই ধীরে ধীরে ষ্টেশন ইয়ার্ড এলাকায় দু'চার বিশজন করে লোক আলাদা আলাদা দাঁড়িয়ে গালগল্পে মেতে উঠলো। আকাশে-বাতাসে যেন এক অদ্ভুত ব্যস্ততা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোকার হদ্দ পর্যন্ত বাতাস শুঁকে বলে দিতে পারে—

আজ কিছু একটা হবে।

আজ কিছু একটা হবে।

আস্তে আস্তে মানুষের আনাগোনা আরো বাড়তে লাগলো। পুলিশ কমতে থাকলো। প্রায় এগারোটার দিকে পুলিশ ফাঁড়িতে আর একজন পুলিশও দেখা গেলো না।

আজ সন্ধ্যার সাথে সাথেই সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয় গেছে। কিন্তু মানুষের জটলা থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে যেন কোন মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

গুলের কানেও কথাটা গেছে। কে যেন কিছু একটা বলেছে। তবে তা খুবই অস্পষ্ট আর ঝাপসা। ব্যাপারটা পরিষ্কার না। কেননা অধিকাংশ লোক জানেই না, কি হবে। ব্যাস, স্রেফ জানে ঃ

কিছু হবে।

আজ রাতে কিছু একটা হবে।

কখন হবে?

কিভাবে হবে?

ক'টায় হবে ?

কোথায় হবে ? এ সম্পর্কে কেউ-ই সঠিক কিছু জানে না।

এ জাতীয় পরিস্থিতিতে প্রায়শঃ এরকমই হয়ে থাকে। মানুষকে একটা রহস্যময় অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে তাদের অস্থিরতাটাকে আরো প্রশস্ত করে ফেলে তারপর মূল কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে গিয়ে তাদের ব্যস্ততার ধারাই পাল্টে দেয়।

অস্থির জনতা সামনে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে। খারাপ হোক, ভালো হোক, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন কারই বা পড়ে! স্রেফ যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তারা প্রথমেই করে। কিন্তু জনতার কাতারে যারা সামিল হয়, তারা চিন্তা-ভাবনাটা পরে করে।

আর যারা শুরু থেকেই ব্যাপারটার চিন্তা-ভাবনা করে, তারা জানে যে, এই বিক্ষুব্ধ জনতা পরে চিন্তা-ভাবনা করবে। কিন্তু ততক্ষণে সময় গড়িয়ে যায় এবং যারা প্রথমেই চিন্তা-ভাবনা করে রেখেছে, তাদের কাজও হাসিল হয়ে যায়।

প্রায় দশটার দিকে চিন্তামণি তার দলবল নিয়ে মিল ফটকের সামনে এসে উপস্থিত হলো। এখানে এসেই সে তার লোকজনদের মদ পান করাবার জন্য প্রথম নির্দেশ পেলো। এর জন্য তাকে টাকাও দেয়া হয়েছে। সুতরাং মদ পান করানো এমন কি কঠিন।

ফটকের কাছেই বিভিন্ন গাছগাছালির সামনে ঝুপড়ির মতো যে ঘরটা আছে, তাতে দেশী মদ বিক্রি হয়। মিলের শ্রমিকরা মাঝে মধ্যে তাদের পরিশ্রমক্লান্ত শরীরটাকে কিছুটা চাঙ্গা করার জন্য এখানে আসে, মদপান করে।

লোকজন প্রায় বারোটা পর্যন্ত ঝুপড়ির ভেতরে বসে বসে মদ পান করতে থাকলো। ভুনা মাছ আর কাবাব খেতে থাকলো। মদ পানির মতো গড়াগড়ি যাচ্ছিলো। আর মানুষের কথাবার্তার ধারা সমুদ্রের মতো ঢেউ খেলছিলো।

সব চিন্ত-ভাবনা, জ্ঞান-গম্যি এলকোহলের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলে চিন্তামণি দ্বিতীয় নির্দেশ পেলো। এবং টাকা

পয়সাও তার পকেটে গুঁজে দেয়া হলো।

চিন্তামণি তার বিশ্বস্ত লেফটেনেন্ট সুরজকে ঝুপড়ির মধ্যে রেখে বাইরে চলে গেলো। তিনজনকে নিজের সাথে নিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে এলো। সাথে তিন পিপা মাটির তেল আর আগুন লাগাবার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম।

রাত বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে শেষ মেলট্রেন ষ্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। এর পরের আপ ট্রেন তিন ঘণ্টা পরে আসবে। ঠিক এই সময় ষ্টেশন ইয়ার্ডের ওদিকে লকলকে অগ্নিশিখা দেখা গেলো। আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে। এবং কে যেন চীৎকার দিয়ে বলছে, 'যাযাবরদের তাঁবুতে আগুন লেগেছে।'

এবং ঠিক তখনি হামিদে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ইয়া আলী।'

মাধু লাঠি উঁচিয়ে দৌড়ে গেলো। এবং উচ্চস্বরে 'হরহর মহাদেব' বলতে বলতে বিনা টিকিটে ষ্টেশনের ভেতর ঢুকে গেলো। তারপর রেলরাস্তা পার হয়ে যাযাবরদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

এক সাথে চারদিক থেকেই হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেছে।

লোকজন লাঠি ছোরা নিয়ে দৌড়ে আসছে। কেউ লোহার রড, কেউ ঘরের খুঁটি খুলে নিয়ে ছুটে আসছে। সবার মুখে উৎকট মদের গন্ধ, তাদের চোখ জোড়ায় পশুর হিংস্রতা, আর পায়ে নেকড়ে বাঘের ক্ষীপ্রতা। শিকারের খোঁজে ওদের নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে।

দু'মিনিটের মধ্যে মানুষ নিজের সভ্যতার সমস্ত পর্দা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জঙ্গলে পৌঁছে গেলো। এবং শিকারের খোঁজে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো।

ওরা কারা?

এদের সাথে ওদের কিসের শত্রুতা?

এরা কারো কোন ক্ষতি করেছিলো?

এসব চিন্তা-ভাবনা তখন কোথায় তলিয়ে গেছে। সামনে একটাই গন্তব্য—

শিকার।

শিকার।

শিকার।

জঙ্গলের রক্ত ডাকছে।

গুল পুরনো ব্রীজের উপর থেকে সবকিছু দেখছে।

যাযাবরদের তাঁবুর সারিতে ভরপুর পুরো ময়দানটাকেই সবাই ঘিরে ধরেছে। ওদের তাঁবুগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। যাযাবররা বড় নমনীয়ভাবে ওদের বাধা দিয়ে আসছে। কিন্তু ওরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। আর আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অনেক বেশী।

আক্রমণটা হঠাৎ হয়েছে। রাতের অন্ধকারে হয়েছে। তাই যাযাবররা ভয়ভীতিতে একেবারে মিইয়ে গেছে।

যাযাবরদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে চেঁচামেচি করছে। যাযাবরদের মেয়েরা এদিকে ওদিকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর হাত-পা ছুঁড়ে জোর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে গুল এ সবকিছু দেখছে।

হঠাৎ মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো তার।

এটা তার শত্রুর গোত্র হলেও এটা তার লাচিরই তো গোত্র। যে লাচি একমাত্র তার জন্যেই জেলে গেছে। এই গোত্রেই তার মা-বাবা আছে। খুব খারাপ। খুব খারাপ। খুব খারাপ।—শত হলেও লাচিরই মা-বাবা।

ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুল কাঁপতে লাগলো।

পর মুহূর্তে দ্রুত পা ফেলে নীচে নেমে ময়দানের দিকে চলে গোলো।

কিন্তু গুল একা ওখানে গিয়ে কি করতে পারবে?

ওরা সংখ্যায় অনেক। আর গুল একা। একা একা ক'জনের সঙ্গে লড়া যাবে?

কিন্তু গুলের পায়ে সামান্য একটা লাঠির আঘাত পড়তেই সে এক কোণে ঢলে পড়লো। তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো এবং সে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। পর মুহূর্তে দু'চারটা পা তাকে পদদলিত

করে গেলো। সে তেমন ব্যথা অনুভব করলো না।

সে বড় কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালো। এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে পুরনো ব্রীজের দিকে ফিরে যেতে লাগলো।

তার ইচ্ছে ছিলো পুলিশকে টেলিফোন করবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সব বেকার, ফালতু।

যাযাবরদের তাঁবু জ্বলছে।

মানুষ মশাল জ্বালিয়ে যাযাবরদের এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অনেক যাযাবর পালিয়ে গেছে। মেয়েরাও যে যেদিকে পেরেছে ছিটকে পালিয়েছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে কাঁদছে। এবং আক্রমণকারীদের কাছে তাদের মা-বাবার কথা জিজ্ঞেস করছে।

একজন গুণ্ডা একটি যাযাবর মেয়েকে ধরে ফেললো। ছোরা দিয়ে চিরে চিরে তার পোষাক খুলে ফেলছে গুণ্ডাটা। সে নিজের হাত দিয়েও মেয়েটির কাপড় খুলতে পারতো। কিন্তু ছোরা দিয়ে কাপড় চিরে ফেলার মধ্যেই সে সম্ভবতঃ অধিক মজা পাচ্ছিলো। সে কাপড় একটা একটা করে চিরে যাযাবর মেয়েটিকে একেবারে উলঙ্গ করে ফেলছে।

আস্তে আস্তে সেই মেয়েটির চারপাশে গুণ্ডাদের প্রচণ্ড ভীড় লেগে গেলো।

গুল দু'হাতে চোখজোড়া ঢেকে ফেললো। পরে ঘুরে ষ্টেশন ইয়ার্ডের বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেলো। এবং সোজা পুলিশ ফাঁড়ির দিকে চলে গেলো।

কিন্তু পুলিশ আসার আগেই গুণ্ডাদের খবর হয়ে গেছে। তাই পুলিশ এসে দেখলো গুণ্ডারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করে ততক্ষণে কেটে পড়েছে। এ কারণেই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে একজন অপরাধীকেও ধরতে পারলো না।

ময়দান একেবারে সাফ।

যাযাবরদের তাঁবু তখনো জ্বলছে।

পাঁচ ছ'জন যাযাবর মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ছটফট করছে।

ভাঙ্গা সরাই, কলস, এলমোনিয়ামের বিভিন্ন থালাবাসন এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক এক কোণে লুকিয়ে থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ছোট্ট শিশু, যাদের চোখের সামনে তাদের মা'দের বেইজ্জতি করেছে, বাবাদের পিটিয়েছে।

শয়তানের চেলারা তাদের হিংস্র বন্য নাচ শেষ করে সবাই কেটে পড়েছে।

স্রেফ অত্যাচারীরাই ওখানে আছে।

কিন্তু ওদেরও কোথাও তেমন দেখা যাচ্ছে না।

পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনার বিবরণ আর জবানবন্দী লিখে নিতে লাগলো। সেপাই আর সান্ত্রীরা চক এলাকা আর বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে টহল দিয়ে ফিরতে লাগলো।

কিছু লোকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আবার এই হাঙ্গামায় অংশ গ্রহণ করেনি। বরং তারা যার যার ঘরে শুয়ে ছিলো এবং এই ঘটনার কিছুই জানে না।

পাঠা!

পরদিন ভোরেই যাযাবর গোত্র ওখান থেকে চলে গেছে।

ময়দান একেবারেই খালি।

কেবল কিছু পোড়া তাঁবু আর কিছু খানা-খন্দক এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে।

এবং কিছু পদচিহ্ন ফুটে রয়েছে।

দশ বারোদিন পর তাও আর দেখা যাবে না। তারপর এই রক্তাক্ত কাহিনীর কোন চিহ্নই আর থাকবে না।

যাযাবররা ষ্টেশন এলাকাটা খালি করে দিয়ে গেছে। আজীবনের জন্য ওরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। খোদা জানে, ওরা কোথায় যাবে, কোন এলাকায় আবার ডেরা বাঁধবে। তবে এটা ঠিক, ওরা আর এ এলাকায় ফিরে আসবে না। এলাকার লোকজন এই বিশ্রী

কলঙ্কটাকে নিজের এলাকা থেকে দূরে করে দিয়েছে। এবং এখন আর এই এলাকায় কোন রকমের অনিশ্চয়তা দেখা দেবে না।

পরদিন বড় নিশ্চিন্ত মনে দোকানপাট খোলা হলো। লোকজন স্বাভাবিক নিয়মে চলাফেরা করতে লাগলো।

পানঅলা—

ফলঅলা—

ট্যাক্সীঅলা—

সবাই আপন আপন গাহাকের চাহিদা পূরণ করার কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যারা আগুন লাগিয়েছে, তারা এখন বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীর জন্য তারা থলে ভর্তি জিনিষপত্র নিয়ে যাচ্ছে।

যারা কাল রাতে যাযাবর মেয়েদের বেইজ্জতি করেছে, তারা এখন নিজের স্ত্রীর জন্য সবুজ পাতায় মোড়া ফুলের তোড়া নিয়ে যাচ্ছে।

জীবন বিলকুল ঠিক, যথার্থ এবং নিরাপদ। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত।

স্রেফ গুলের কাছে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হলো।

এবং সাক্ষাৎকারের দিন লাচির সাথে দেখা করে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলে লাচির মনটা ছটফট করে উঠলো। আর তার মানসপটে একটা অজানা অপরিচিত রাস্তা ভেসে উঠলো, যে রাস্তা পাহাড়, ময়দান আর উপত্যকার উপর দিয়ে চলে গেছে। এবং যার উপর দিয়ে যাযাবরদের কাফেলা কোন এক অজানা গন্তব্যের খোঁজে সব সময় চলছে, চলতে থাকবে।

লাচি ভয় পেয়ে গুলের বুকে মাথা রাখলো এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

তা খুব চাপ নিষেধ করা সত্ত্বেও লাচির ছবি আঁকার ব্যাপারটা সারা জেলে প্রচার হয়ে গেছে।

মেয়েদের সেলেও কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে অনেক মেয়ে

কয়েদী জিনাবাঈর মাধ্যমে লাচিকে দেখার জন্য ভিড় জমাতে শুরু করলো এবং তার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো।

তার মধ্যে বিখ্যাত ফিল্মষ্টার দিলারাও আছে। প্রতারণার অপরাধে দিলারার সাড়ে তিন বছরের সাজা হয়েছে।

দিলারা উচ্চতায় লাচির চেয়েও কিছু লম্বা। মোতির মতো পরিষ্কার গায়ের রঙ। আর একজোড়া কপোলে যেন গোলাপ ফুল হাসছে। চোখ জোড়া পদ্মের মতো পূত পবিত্র।

ওকে দেখে কেউ মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারবে না যে, এ মহিলা কাউকে ধোকা দিতে পারে, কিম্বা প্রতারণা করতে পারে। এ জন্যই তার সাথে পরিচিত হবার পর লাচি যখন তার অপরাধ জানতে পারলো তখন বড় অবাক হলো।

ওরা তখন গোল ময়দানের জাম গাছটার নীচে বসে বসে ঘাস তুলছিলো। জিনা দিলারাকে লাচির কাছে রেখে চলে গেলে ওরা দু'জন কোদাল নিয়ে ঘাস তুলতে থাকলো আর আলাপ-সালাপ করতে লাগলো।

লাচি হেসে বললো, 'তোমাকে দেখে তো মনে হয় না তুমি কাউকে প্রতারণা করতে পারো! বরং প্রতারিত হতে পারো তুমি।'

দিলারাও হাসলো। বললো, 'না, আমি সত্যিই প্রতারণা করেছি। ব্যাটা সিন্ধি শেঠ বড় চালাক লোক। ওর কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা বাগিয়ে নিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'টাকার খুব দরকার ছিলো আমার।'

লাচির নিজের কথা মনে পড়লো।

ঠিকই তো! টাকার দরকার সব সময়ই থাকে। মাঝে মধ্যে খুব মোটা টাকারও প্রয়োজন পড়ে। সামান্য ক'টা টাকার জন্য সে খুন করেছে। এজন্যই ত্রিশ হাজার টাকার প্রতারণা কোন আজব ব্যাপার না। খুব প্রয়োজন হয়েছিলো বলেই সে প্রতারণা করেছে।

তবুও লাচি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ফিল্মে কাজ করে কত টাকা পাও?'

'আমি মাসে পনের বিশ হাজার টাকা রোজগার করি।'

'তাহলে ত্রিশ হাজার টাকার জন্য প্রতারণা করলে কেন?'

'আমি একটা গাড়ী কিনতে চেয়েছিলাম। এক মহারাজা গাড়ীটা ষাট হাজার টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছে। আর গাড়ীটাও এমন চমৎকার যে ষাট হাজার টাকায় অনেক সস্তা ছিলো। অথচ এই ষাট হাজার টাকাও আমার কাছে ছিলো না। আর এই সিন্ধী লোকটা অনেক দিন থেকে আমার পেছনে ঘুরছিলো। ব্যস আমিও বোকা বানিয়ে ছাড়লাম।'

'একটা গাড়ীর জন্যে? এর আগে তোমার কাছে কোন গাড়ী ছিলো না?'

'হুঁ—ছিলো। দু'টো ছিলো। কিন্তু আমি তো নতুন গাড়ীটাই নিতে চাচ্ছিলাম। আর গাড়ীটাও—তুমি দেখলে পাগল হয়ে যাবে। উঃ কেমন প্রিয় সুইট গাড়ী, সিলভার গ্রে!'

দিলারা কোদাল ছেড়ে দু'হাতে বুক চেপে ধরলো। ওর দু'হাতে সিলভার গ্রে গাড়ী চকচক করছে।

লাচি অনেকক্ষণ কিছু বললো না। স্রেফ মাথা নীচু করে কোদাল দিয়ে ঘাসের গোড়ার মাটি খুঁড়তে লাগলো।

তার কিছু বোন ছিলো—প্রাচীন রীতি-নীতির যাঁতা কলে পড়ে বিক্রি বন্ধক হয়ে গেছে; দারিদ্র্য, অনাহার আর অসভ্যতার শিকার হয়ে গেছে। সেই মেয়েগুলো যদি চুরি করতো, প্রতারণা করতো তাহলে না হয় তার বুঝে আসতো। কিন্তু এই যে একটি নতুন গাড়ীর জন্যে প্রতারণা করা, এটা লাচির বুঝে এলো না। যেখানে তার দু'টো গাড়ী আগে থেকেই আছে।

লাচি চোখ তুলে দিলারাকে দেখলো।

কত সুন্দর মিষ্টি মেয়ে, সত্যি কোন মোটর গাড়ী ওর চেয়ে সুন্দর হতে পারে না।

আর মানুষ একটা ভালো সুন্দরকে বিক্রি করে খারাপ সুন্দর কেমন করে কিনে নিতে পারে!

এটা কোন ধরনের বেচা কেনা ?

হঠাৎ লাচি রেগে গিয়ে বললো, 'লোহার একটা সামান্য গাড়ীর জন্য প্রতারণা করতে তোমার লজ্জা করলো না ?'

দিলারা প্রসন্ন মনে লাচির দিকে তাকালো। তার মোটেও রাগ হলো না। পরে আস্তে হেসে দিলো।

কিন্তু লাচির চোখ দিয়ে বিশ্বস্ততা আর সত্যবাদিতার যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুতে দেখলো তার আঁচ সহ্য করতে পারলো না দিলারা। তার চোখজোড়া নীচে ঝুকে গেলো। এবং কোদালের সাহায্যে উপড়ে-নেয়া ঘাসের গোড়া থেকে ঝুরঝুরে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বললো সে, 'সাত বছর বয়েসে আমি প্রথম বিক্রি হই। স্বয়ং আমার মা-বাবা আটশ' টাকার বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিলো। তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'করবো', লাচি বললো, 'আমাদের ওখানেও তাই হয়ে থাকে। স্বয়ং আমার সাথেও তাই হয়েছে।'

সাত বছর থেকে সতের বছরের মধ্যে আমি দশবার বিক্রি হয়েছি। প্রতি বছরই আমার বাবা বদল হতো। প্রতি বছরই একজন করে নতুন খরিদ্দার আসতো। এবং প্রতি বছর আমার মূল্য বেড়ে যেতো। কেননা আমি খুব সুন্দরী ছিলাম তো !'

'হ্যাঁ, তুমি সত্যি খুব সুন্দরী।' লাচি বললো, 'অবিকল পুতুলের মতো।'

দিলারা বললো, 'আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন খরিদ্দারই ছিলো আমার বাবা। তারপর যখন বড় হলাম তখন সেই বাবা হয়ে গেলো স্বামী। যখন আমি ফিল্মে চলে এলাম তখন আর না রইলো আমার মা, না রইলো বাবা, না রইলো স্বামী। তখন সবাই হয়ে গেলো দালাল। এ জন্যেই কোনটা প্রতারণা, কোনটা প্রতারণা নয় এবং সৎ আচরণই বা কি—এসবের কিছুই আমি জানি না।

'কিন্তু আমি জানি।' লাচি বড় বিশ্বস্ততার সাথে বললো।

কিছুক্ষণ ওরা দু'জন চুপ থাকলো। দু'জনেরই হাতের কোদাল আস্তে আস্তে চলতে থাকলো। পরে লাচি বললো, 'আমি কি ফিল্মষ্টার হতে পারবো?'

'একটু দাঁড়াও তো!' দিলারা ইঙ্গিত করলো।

লাচি কোদাল একদিকে ফেলে জামগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

দিলারাও গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। এবং তার দিকে লোভাতুর দৃষ্টির বাণ হেনে বললো, 'আরে! তোমাকে তো লুটেপুটে নিয়ে যাবে!'

লাচি হাসতে হাসতে বললো, 'হামিদেও তাই বলতো।'

'হামিদে কে?'

'এক ট্যাক্সীর ড্রাইভার।'

'হুঃ!' দিলারা অবজ্ঞার সুরে বললো, 'ট্যাক্সীঅলা তোমাকে কি ফিল্মষ্টার বানাবে? আমি বানাতে পারি।'

'সত্যি? কিন্তু তার জন্যে আমাকে কি করতে হবে?' লাচি নিজের মনের বাসনা ব্যক্ত করে জিজ্ঞেস করলো।

'সবচে আগে নিজের ইজ্জত দিতে হবে।'

লাচি দপ করে জামগাছের নীচে বসে পড়লো।

'তুমিও? দিলারা তুমিও এ কথা বলছো? তাহলে তো এই জেল বরং অনেক ভালো।' লাচি দৃঢ় স্বরে বললো এবং কোদাল চালাতে লাগলো।

এ সময় জিনাবাঈ ছুটে এলো এবং দিলারাকে বলতে লাগলো, 'চলো, তোমাকে কালীচরণ বাবু অফিসে ডাকছে।'

দিলারা চমকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার?'

'কোন এক প্রডিউসার এসেছে তোমার সাথে দেখা করার জন্যে।'

দিলারা কোদাল ফেলে দিলো। পাশের নল থেকে হাত ধুলো। তারপর জিনাবাঈর সাথে কালীচরণের অফিসের দিকে চলে গেলো।

কালীচরণের অফিসে হাজী আবদুস সালাম আর মীর চন্দানী বসে ছিলেন। দিলারা ভেতরে ঢুকেই মীর চন্দানীর বগলের কাছে বসে পড়লো। এবং তার সিগ্রেটের ডিব্বা থেকে একটা সিগ্রেট নিয়ে মুখে পুরে দিলো।

হাজী আর মীর চন্দানী দু'জনেই আপন আপন লাইটার জ্বালিয়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। দিলারার সামনে, ডানে-বামে দু'টো লাইটার জ্বলছে। দিলারা দু'দিকেই তাকালো। পরে হাজীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে। এবং মীর চন্দানীর লাইটারের উপর ঝুকে পড়লো।

মুহূর্তের মধ্যে দিলারার পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে নরম নাজুক ধূয়োর কুণ্ডলী বেরুতে লাগলো।

হাজী উদাস হয়ে নিজের লাইটার নিভিয়ে ফেললেন।

হাজী দিলারাকে মনপ্রাণ দিয়ে কামনা করেন। তার জন্যে দিন-রাত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তার জন্যে বিশ হাজার পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত। কিন্তু দিলারা যখনি কথা বলে, এক লাখের নীচে কথা বলে না।

প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপার, হাজী ভাবেন, কোন ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপার তো নয় যে মানুষ এক লাখের জায়গায় দশ লাখের জুয়া খেলবে।···ব্যবসায়ে রিস্ক নিতেই হয়। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে এতো রিস্ক কে নেয়···পনের বিশ হাজার হলে না হয় কোন কথা ছিলো!

যা হোক তবু এ টাকাও না হয় দিলারার জন্যে খরচ করা গেলো, কিন্তু হতভাগী দিলারা তো প্রেমকে ব্যবসায় রূপান্তরিত করে বসে আছে।

এখন তাকে কে বুঝাবে যে, ব্যবসা, ব্যস ব্যবসাই। আর প্রেম স্রেফ প্রেম। ব্যবসাকে ব্যবসার পথে চলতে দেয়াই ভালো। আর প্রেমকে নিছক প্রেম, অর্থাৎ চিত্তবিনোদনের দৃষ্টিতে দেখা উচিত।

হুঃ! বাদ দাও, আরো কতো পাওয়া যাবে। দুনিয়ায় মেয়ে মানুষের কি কমতি আছে!

আর মীর চন্দানী তো এক পয়সাও দেবার লোক নন। দিলারার সাথে তার প্রেম-মোহব্বতও নেই। তাকে স্রেফ প্রফুল্ল মন নিয়ে খুব সুন্দর একজন মানুষের দৃষ্টিতেই দেখে থাকেন তিনি। কিছু সুন্দর মনোমুগ্ধকর সময়ের সঙ্গী মাত্র।

উভয়েরই ব্রিজ খেলার সখ বেজায়। এছাড়া, ভালো সিগ্রেটের, ভালো কাপড়-চোপড়ের, ভালো মোটর গাড়ীর এবং ভালো মদেরও খুব সখ। নারী আর পুরুষের সম্পর্ক মীর চন্দানীর কাছে পরস্পরের পরিপূরক ছাড়া আর কিছু নয়।

মীর চন্দানীর কাছে নারী ভালো লাগে স্রেফ এ কারণে যে, ওরা কিছু সুন্দর মুহূর্তের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। ড্রয়িংরুমে ওদের মায়াময় চকচকে চেহারা, রঙীন শাড়ী, আঁটসাঁট দেহ এবং বোকার মতো কথা বার্তা কত সুন্দর মনে হয়।

মানুষ শ্বাসরুদ্ধকর বাজার, ব্ল্যাক মার্কেট, প্রতারণা আর চারশ' বিশের পৃথিবী থেকে বেরিয়ে একটা নিষ্পাপ, সুন্দর আর মোলায়েম পৃথিবীতে পৌঁছে যেতে চায়।

ব্যবসায়ীদের জন্যে সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম আর একরাশ ক্লান্তির পর মেয়েমানুষের প্রয়োজন পড়ে বই কি, যে রকম ব্যথা বেদনার জন্য এ্যাসপ্রো কিম্বা এনাসিনের প্রয়োজন পড়ে। কিম্বা এ জাতীয় সুন্দর মসৃণ কাগজে মোড়া অন্য কোন সাদা টেবলেটের।

নারী আর সেসব টেবলেটের মোড়কের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য তো নেই। অন্ততঃ মীর চন্দানী তাই মনে করেন। তবে আশ্চর্যের কথা হলো, দিলারা এর থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তার জীবন যেভাবে কেটেছে, যেভাবে সে সমাজের খোলা বাজারে বার বার বেচা-কেনা হয়েছে, সেদিকটা খেয়াল করলে দিলারার ব্যাপারে মীর চন্দানীর ধ্যান-ধারণাটা একটু অন্য রকম মনে হয়।

সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করে দিলারা নিজের সুন্দর তুলতুলে বাহু দিয়ে মীর চন্দানীর কাঁধ জড়িয়ে ধরলো। তারপর বড়ই নিষ্পাপ হাসি হেসে হাজীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'হাজী চাচা, বলুন কি প্রোগ্রাম?—কি বে কালে, আমাকে কেন ডেকেছিস?' হাজীর দিক থেকে

দৃষ্টি সরিয়ে কালীচরণের দিকে বাণ হানলো দিলারা।

পুরুষের রাজ্যে মেয়েরা সব সময়ই একটু চৌকস হয়ে থাকে। তীর-কামান নিয়ে সদা প্রস্তুত থাকে। সুতরাং কালীচরণকে একটু অপমান, অপ্রস্তুত করবে না তো কি করবে? ওর হৃদয়মনে দৃষ্টির বাণ নিক্ষেপ না করলে দিন-রাত ওর প্রতি এতো পক্ষপাত কি করে দেখাবে?

দিলারাকে দেখলেই কালীচরণের হৃদয়টা সব সময় কাঁপতে থাকে। দিলারা ভালো করেই জানে, কেন সে কাঁপে এবং কি সে চায়? যেদিন তার চাহিদা পূরণ করে দেবে সেদিন আর কাঁপবে না, কিছু চাইবেও না। অহঙ্কারে সেদিন থেকে তার মাথা উঁচু হয়ে যাবে। গর্বিতভাবে পৃথিবীর মানুষগুলোর দিকে তাকাবে এবং ঘৃণাভরে দিলারাকে দেখবে……এজন্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা হলো বদমাশটাকে কালে বলে ডাকা। এবং কখনো-সখনো যদি খুব বেশী গ্যাঞ্জাম করতে চায় শ'পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়া।

কারণ কালীচরণের আপাদমস্তক লোভ-লালসায় ভরা।

তুমি তার কামনা পূরণ করতে না পারো, তার লালসার আগুন তো নিভাতে পারো! কেননা কালীচরণের হৃদয়ে আবেগ অনুভূতির অভাব নেই। কিন্তু সেসব আবেগ অনুভূতি পয়সার বিনিময়ে বদলে যায়।

নারীর প্রেম

মা'র মমতা

পিতার রোগশোক

কয়েদীর পায়ের বেড়ী

প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদ

সবকিছুর দিকেই সে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়, যেন সব আবেগ অনুভূতিকে হাতে নিয়ে ওজন করছে। এবং শেষে সবকিছুর উপর টাকা-পয়সার লেবেল এঁটে দেয়। অমুক আবেগের দাম এতো পয়সা এবং অমুক অনুগ্রহের জন্যে এতো টাকা শোধ করো, তাহলেই কালীচরণ তোমার……

হাজী আবদুস সালাম বললেন, আজ 'অনেকদিন পর দিলদার রোডে যাবার জন্যে মনটা বড় ছটফট করছে। গান শুনবো।'

দিলারা তো সব সময় এ জাতীয় কাজের জন্যে প্রস্তুতই থাকে। তৎক্ষণাৎ বললো, 'আরে খুব মজা হবে। লক্ষ্ণৌর এক কুঠিতে আমিও দু'বছর বসেছিলাম। বাহবা! কেমন দিন ছিলো···পুরনো স্মৃতিগুলো আবার চাঙ্গা হবে। আমিও একটা ঠুমরি গাইবো।'

'তাহলে তুমি আমাদের সাথে যাচ্ছো তো?' হাজী আবদুস সালাম কথা পাকা করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন।

দিলারা ঘুরে মীর চন্দানীর দিকে তাকালো। পরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি যাচ্ছো না?'

মীর চন্দানী বললেন, 'আমি ভাবছি, আজ রাতে আমার ভাবীর বোনের ননদিনীর·····

'আরে সেই যে ডালিং রোডের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হতভাগীটার কথা বলছো তুমি···?' দিলারা বললো, 'না, তুমি যেতে পারবে না। যদি যাও তাহলে আমি জেল সুপারেণ্টেণ্ডেণ্টকে রিপোর্ট করবো। জেল থেকে বেরিয়েছি এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। তুমি কি চাও আমি এখানে শুধু ধুকে ধুকে মরি!'

মীর চন্দানী মাথা নীচু করে ফেললেন। বললেন, 'ঠিক আছে ম্যাডাম, আজ গান শুনতেই যাবো। যেখানেই বলবে যাবো।'

অপমানে হাজীর মুখ লাল হয়ে গেলো। তিনি মীর চন্দানীর সাথে বসে প্রোগ্রাম তৈরী করেছিলেন, মীর চন্দানী যাবেন ডালিং রোডে তার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্ধুর ওখানে। আর হাজী যাবেন দিলারাকে নিয়ে দিলদার রোডে গান শুনতে।

কিন্তু হতভাগী দিলারা সব প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করে দিলো। এখন হতভাগীটা যেখানেই যাবে, মীর চন্দানীর বগল ঘেঁষেই বসবে। সব আনন্দই তো মাটি।

অনেক কষ্ট করে তিনি কালীচরণকে পাঁচশ টাকা দিয়ে প্রোগ্রামটার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু·····

'তাহলে—তাহলে—আমার কি হবে?'

শেষ পর্যন্ত হাজী বলেই বসলেন।

'চিন্তা করো না চাচাজি! তোমার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করছি।'

'কে?'

'লাচি!' দিলারা বললো।

'লাচি?' হাজী জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়ে?'

'মেয়ে তো নয় ডিনামাইট!'

মীর চন্দানী আস্তে বললেন। পরে সিগ্রেট ধরাবার জন্যে ম্যাচ জ্বাললেন এবং অনেকক্ষণ তাকে দেখতে থাকলেন। অথচ এর মধ্যে ম্যাচের কাঠি জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। আর সিগ্রেটও যেই কে সেই রয়ে গেছে।

কালীচরণ একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম আপনারা মাত্র তিনজনই বাইরে যাবেন। এখন আরো একজন বাড়লো, সুতরাং আপনাদের সাথে আরো একজন ওয়ার্ডারও দিতে হবে। কাজেই দু'শ টাকা আরো বেশী লাগবে।

মীর চন্দানী পকেট থেকে আরো দু'শ টাকার নোট কালীচরণের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'দোস্ত, তুমি তো এতো টাকা নাও যে, কোন রেণ্ডির ঘরেও এতো টাকা নেয় না।'

কালাচরণ বেল টিপে চাপরাশীকে বললেন, 'জিনাবাঈকে ডাকো।'

সিদ্ধান্ত হলো দিলারা সরকারীভাবে জেলথেকে বাইরে যাবে একজন প্রডিউসারের প্রযোজনীয় শুটিংয়ে, অংশ গ্রহণ করার জন্য। রাত ন'টার দিকে সে চলে যাবে। দশটায় যখন পাহারা বদল হবে তখন জেলের বাইরে একখানি কালো গাড়ী হাজী আবদুস সালাম, মীর চান্দানী আর লাচির জন্য অপেক্ষা করবে। এদের তিন জনের সঙ্গে তিন জন ওয়ার্ডারও থাকবে। আর দিলারার সাথে থাকবে দু'জন ওয়ার্ডার। ভোর পাঁচটায় পাহারা বদলের আগেই এরা ফিরে আসবে। এবং কেউ ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা টের পাবে না।

দিলারা লাচিকে পটিয়ে নিলো। আর লাচিও স্রেফ এ কারণে মেনে নিলো যে, সে কোনদিন রেণ্ডির কুঠি দেখেনি। যা হোক, দিলারা লাচিকে ভালো করে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাত ন'টায় জেল থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে সবুজ রঙের একখানি গাড়ী তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। দিলারা গাড়ীতে উঠেই সামনের দিকে এগুতে নির্দেশ দিলো। তারপর জেলের পশ্চিম দিকে গিয়ে গাড়ীটা আবার থামিয়ে ওদের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

রাত দশটার দিকে হাজীর কালো রঙের কেডিলাক গাড়ীতে করে মীর চন্দানী, লাচি এবং তিনজন ওয়ার্ডার এসে পৌঁছলো। দিলারা সবুজ গাড়ীটা ছেড়ে দিলো। এবং যেহেতু গাড়ীতে জায়গা কম, সুতরাং সে বড় নিশ্চিন্তমনে কেডিলাক গাড়ীর ভেতরে ঢুকেই মীর চন্দানীর কোলের উপর বসে পড়লো। আর তার সঙ্গের দু'জন ওয়ার্ডারের একজনকে বসালো সামনের সিটে। বাকী একজনকে জায়গা করে দেয়ার জন্যে দিলারা লাচিকে হাজীর কোলে বসার জন্যে। বললো

'না, আমি কারো কোলে বসতে পারবো না।' লাচি রাগে চেঁচিয়ে উঠলো।

'আরে মোটে তো কয়েক মিনিটের ব্যাপার।' দিলারা আশ্বাস দিতে দিতে বললো, 'গাড়ীতে জায়গা কম বলেই তো বলছি। এবং এটিকেটও তাই বলে।'

'চুলোয় যাক তোমাদের এটিকেট।' লাচি স্থির সিদ্ধান্তে অটল থাকলো, 'দাড়িয়াল হাজীর কোলে তোমার ওয়ার্ডারকে বসাও।'

লাচি যখন মানলোই না, তখন ঠাসাঠাসি করে বেচারী ওয়ার্ডার কোন রকমে গাড়ীতে বসেই পড়লো। এবং গাড়ী দিলদার রোডে রওনা দিলো।

দিলদার রোড এক অদ্ভুত ধরনের বাজার। একদিকে রেণ্ডি মেয়েদের কুঠি, অন্যদিকে কয়েকটি লাকড়ির দোকান এবং পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকান।

এখানে সব রকমের মেয়ে মানুষ আর লাকড়ি বিক্রি হয়। ছোট, বড়, সস্তা, দামী সব রকমের লাকড়ি এখানে পাওয়া যায়। বাঁশের লাকড়ি, বাবলা গাছের লাকড়ি, সেগুন গাছের লাকড়ি—যেগুলোকে উঁই পোকা খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। আর মেয়ে মানুষ, সব রকমের মেয়ে মানুষ—যাদের যৌন রোগে শেষ করে দিয়েছে।

সস্তা লাকড়ি আর দামী লাকড়ি।

মেয়ে মানুষ রঙচটা লোহার পাতের মতো খোলা দরোজার সামনে বসে বসে গাহাকের প্রতীক্ষা করছে।

নর্দমা পেচ্ছাবের দুর্গন্ধ আর মদ্যপায়ীদের কফ-কাশিতে ভরপুর। এবং তার উপর বাসী চামেলী ফুল ভাসছে।

এবং বিভিন্ন ঘরে তবলার তাল, সারেঙ্গির লয়, ঠুমরী আর বিভিন্ন সস্তা ফিল্মী গান যেন মৌমাছির মতো ভন ভন করছে। এবং এ সবকিছুর উপর অন্ধকার যেন কুয়াশার মতো ছেয়ে আছে।

এসব নরক গুলজার অবস্থা দেখে লাচির ঘৃণা ধরে গেলো। রাগে ঘৃণায় থুথু ছিটিয়ে লাচি বললো, 'আমাকে জেলে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

'এখনো তো রাতের যৌবন কাটেনি প্রিয়ে।' হাজী লাচির বাহু ধরে বললেন।

তার পেটে ইতিমধ্যেই হুইস্কির চার পেগ গেছে। এবং চার পেগ পান করার পর মানুষের যে রকম থাকার কথা, তিনি আছেনও ঠিক সে রকমই।

লাচি তার হাত থেকে নিজের বাহু ছাড়াবার চেষ্টা করলো। আস্তে আস্তে, সাবধানে, ভদ্র আর নম্রভাবে।

কিন্তু হাজী জোর করে তাকে নিজের কাছে টেনে বসিয়ে দিলেন। এবং তার কোমরে হাত রেখে বললেন, 'এসো, পান করো।'

লাচি তার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে নিলো। এবং তার মাথায় ঢেলে দিয়ে বললো, 'শুয়রের বাচ্চা হারামী!'

মীর চন্দানী রাগে লাচির মুখে কষে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন।

এতে লাচি খুব রেগে গেলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে মীর চন্দানীকে

দু'হাতে ধরে নীচে ফেলে দিলো।

হাজী তার সাহায্যে এগিয়ে এলে লাচি তাকেও একদিকে চিৎ করে ফেলে দিলো। তারপর দু'জনের বুকে চড়ে তবলা বাজানোর মতো দু'জনের মাথা ঠোকাঠুকি শুরু করে দিলো। এবং জোরে জোরে চিৎকার দিতে লাগলো।

'তাক ধিনা ধিন তাক, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন তাক।'

মীর চন্দানী আর হাজী চেঁচাতে থাকলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ভিড় জমে গেলো।

লাচি, ওয়ার্ডার, বিভিন্ন গাহাক, সারেঙ্গিঅলা, ফলঅলা এবং আতর বিক্রেতা সবাই এসে ভিড় জমালো। আর সবার মাঝখানে লাচি বাঘিনীর মতো হিংস্র ফণা তুলে ওদেরকে পিটাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত পৈশাচিক কাণ্ড। লাচি জোরে জোরে বন্য পশুর মতো চেঁচাচ্ছে আর নাচছে।

'তাক ধিনা ধিন তা।'

দেখতে দেখতে বিভিন্ন সিঁড়ি দিয়ে শব্দ তুলতে তুলতে ছুটে এলো পুলিশ। ইনস্পেক্টর, সাব ইনস্পেক্টর এবং হাওয়ালদার, সান্ত্রী—সবাই এসে উপস্থিত।

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই চুপচাপ।

পুলিশ সবাইকে গ্রেফতার করলো।

ওয়ার্ডাররা সান্ত্রীর কানে কানে অনেক ফিস ফাস করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

হাওয়ালদার বললো, 'যা কিছু বলার ফাঁড়িতে গিয়ে বলবে।'

সবাইকে হাজতে পুরে দেয়ার পর একজন ওয়ার্ডারের কথামতো এসিষ্ট্যাণ্ট জেলার কালীচরণকে টেলিফোনে ডেকে আনা হলো। কালীচরণ ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে এলেন। তার মুখ দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। পুলিশ যদি ব্যাপারটা চেপে না রাখে

তাহলে তার চাকরী তো চাকরী, জেল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

ইনস্পেক্টর আর ডেপুটি জেলার মুখ গম্ভীর করে বসলেন। পরে কালীচরণ হাজী আর মীর চন্দানীর সাথে দেখা করলেন। তারপর হাত প্রথম পকেট থেকে দ্বিতীয় পকেটে গিয়ে ঢুকলো। দ্বিতীয় পকেট থেকে তৃতীয় পকেটে। তারপর গিয়ে ব্যাপারটার মিটমাট হলো। তা হবেই বা কেন? মীর চন্দানী আর হাজী ভালো করেই জানেন, পকেটের জোর হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জোর।

ভোর পাঁচটার আগে ফুর্তিবাজের দল আবার গিয়ে জেলে প্রবেশ করলে, কালীচরণের স্বস্তি ফিরে এলো। ইজ্জত রক্ষা. তা না হলে চাকরীই চলে যেতো।

কালীচরণের যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে তিনি এ ঘটনার পর জেলের ভেতরেই লাচিকে খুব কঠিন সাজা দিতেন। কেননা লাচির একগুঁয়েমির কারণেই এতো গণ্ডগোল হলো। উপযুক্ত সময়ে যদি পুলিশ ইনস্পেক্টর তার সহযোগী অফিসার ভাইদের উপকার করতে রাজী না হতো, তাহলে পরদিন পত্র-পত্রিকাঅলারা খুব হৈ-চৈ শুরু করে দিতো। আর কথা বানাতে ওস্তাদ সাংবাদিকরাও প্রশ্ন করতে বাধ্য হতো, 'জেলের কয়েদী কেমন করে পুলিশ হাজতে এলো?'

লাচির উপর খুব রাগ হলো তার। অসভ্য, নীচ, যাযাবর ছুকরী, নিজেকে কি মনে করে সে?'

তার মন চাইলো কিছুর সাথে বেঁধে লাচির পিঠে বেত মারতে। এবং বল্পনায় তাই তিনি করলেন। ফলে সাময়িকভাবে কিছুটা স্বস্তি পেলেন বটে কালীচরণ।

কিন্তু যেখানে বাস্তবের সাথে সম্পর্ক—খুব চান্দ লাচির ছবি আঁকছেন। এজন্যে লাচির অপমানের সাথে স্বয়ং জেল সুপারেন্টও জড়িত। এ কারণেই লাচির প্রতি একটু খারাপ ব্যবহার করলেই তা সোজা জেল সুপারেন্টেণ্ডেন্টের কাছে গিয়ে বলে দেবে লাচি। সমস্ত ঘটনা তখন প্রকাশ হয়ে পড়বে। ফলে নেয়াটা দেয়াতেই

চলে যাবে।

এ কারণেই কালীচরণ চুপ থাকলেন। লাচির প্রতি কোন অনুসন্ধান-মূলক কার্য পরিচালনা করলেন না।

জিনাবাঈ লাচিকে স্রেফ এটুকুন সাবধান করে দিয়েছে, যেন এ ঘটনার কথা খুব চান্দ বা অন্য কারো কাছে প্রকাশ না করে। তা না হলে জিনাবাঈর কঠিন সাজা হয়ে যাবে। বুড়ী জিনা-বাঈর খাতিরে লাচি চুপ করে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

তবে এ ঘটনার পর দিলারার সাথে লাচির সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। ওরা পরস্পর কথাবার্তা বলতেও আর রাজী নয়। এর পেছনে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। কিম্বা তাদের দু'জনের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কিত কোন ঝগড়াও নেই। দু'জনের কেউ কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ কিম্বা বন্ধুভাবও পোষণ করে না। তাদের এই বিরোধ সম্পূর্ণরূপে নীতির বিরোধ।

দিলারার ধারণা, নিজের ইজ্জত-হুরমতকে লাচি প্রয়োজনের চাইতেও বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে এবং ইজ্জত জিনিষটা মেয়েদের আত্মা আর ব্যক্তিত্বকে পরিবেষ্টন করে রাখে। আসলে এ ধারণা ভুল। ইজ্জত তো ধরতে গেলে মেয়েদের হাতের এক ধরনের অস্ত্র। যেটা নিজের জীবনকে সুন্দর করার জন্যে এবং পার্থিব সুখ-শান্তির জন্যে সুযোগমতো ব্যবহার করা যায়। এর মধ্যে কোন রকমের আবে-গের স্থান না থাকাই ভালো।

আর লাচির ধারণা, কে জানে তার কি ধারণা, সে তো আর পড়ালেখা জানা মেয়ে নয় যে, দিলারার মতো নিজের মনের কথা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে। ব্যস, তার একটা জিদ ছিলো, একটা পাগলামী ছিলো যেটা তার মাথায় সোয়ার হয়েছিলো।

সে বলে, 'আমি বিক্রি হবো না। কোন মূল্যের বিনিময়েও আমি বিক্রি হবো না। আর এই যে দিলারা মেয়েটি, দেখতে যাকে খুব সুন্দর নিষ্পাপ মনে হয়, আসলে কিন্তু একটা আওয়ারা, বদমাশ মেয়ে। তার সাথে আমি কোনদিন আর মিশবো না।'

এটাকে যদি আপনি নীতি বলেন, তাহলে মনে করুন এটাই

লাচির নীতি।

কিন্তু এই পৃথিবীতে সবকিছুই হয়। কেননা এই পৃথিবী বড়ই জটিল আর যুক্তিবাদী। এখানে যাদ লাচির মতোই কোন মেয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে আওয়ারা ঘুরে বেড়ায়, তাহলে সবাই চাইবে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে। অবশ্য এটা কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, সেই মেয়েটির ভালোর জন্যেই। এবং এ জাতীয় বোকামী, ভুল আর অসম নীতি মনে লালন করে কোন নারীই এই পৃথিবীতে চলতে পারে না।

এ সবকিছু চিন্তা করেই জিনাবাঈ এবং জেলের অন্যান্য মেয়েরাও লাচিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো। এবং এক নাগাড়ে দেড় দু'বছর ধরে প্রচেষ্টা চালাতে থাকলো। হাজী আবদুস সালাম আর মীর চন্দানীও এর পেছনে অনেক টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন।

এছাড়া আরো একটা ব্যাপার ছিলো। হাজী আবদুস সালাম আর মীর চন্দানী দু'জনেই সেই রাতের ভীতিপ্রদ ঘটনার পর মনে মনে স্থির সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন যে, যেভাবেই হোক লাচির এই অহঙ্কার ভাঙ্গতেই হবে। তার এই ব্যক্তিত্ব, এবং রূপ-সৌন্দর্যের এই দুর্লভ সম্মানকে দলিত মথিত করে দিতেই হবে।

এই কাজের জন্যে হাজী আবদুস সালাম আর মীর চন্দানী জিনাবাঈকে কনট্রাক্ট দিয়ে দিলেন। কারণ এই ভদ্র পৃথিবীতে সবকিছুই আজকাল কনট্রাক্টের মাধ্যমে হয়। তারা উভয় ব্যাঙ্কার এই কাজের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করলেন। তারা যে দিলারার জন্যে পনের-বিশ হাজার টাকা খরচ করাকে নিজেদের ব্যবসার খাতিরে রীতিবিরুদ্ধ মনে করেন, এখন রাগের বশবর্তী হয়ে পঞ্চাশ হাজার খরচ করতেও তাদের কোন আপত্তি নেই।

এসব ব্যবসায়ীদের রাগটাও তাদের টাকা-পয়সার মতোই। এরা যদি ধর্মকর্মে মনোযোগ দেন তো মন্দির আর মসজিদ বানাবার জন্যেও এরা হাজার হাজার টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত হন না। যদি প্রতি-

শোধ গ্রহণ করতে চান, তাহলে হাজার হাজার টাকা খরচ করে আমাকে আপনাকে জানে মেরে ফেলতেও তাদের কোন বেগ পেতে হয় না। যদি প্রেম করতে চান, তাহলে আপন প্রেমিকাকে সোনা-রূপো দিয়ে মুড়ে দিতেও কোন অসুবিধা বোধ করেন না।

তাদের সামনে একজন গরীব মানুষ প্রেম করার সাহসই বা কি করে করতে পারে?

তার উপর লাচির মতো বন্ধু-বান্ধবহীন, সহায়-সম্বলহীন একটি নারী কতদিন আর সোনার রাস্তা দিয়ে না হেঁটে থাকতে পারবে? সেটাও দেখতে হবে বই কি।

এজন্যেই অনেক চিন্তা-ভাবনার পর 'প্রজেক্ট লাচি' অনুমোদন করা হয়েছে। কনট্রাক্ট দেয়া হয়ে গেছে। এবং কাজের জন্যে লোকও নিয়োগ করা হয়ে গেছে।

কিন্তু ফলাফল:

'আমি বিক্রি হবো না! মরে যাবো। কিন্তু তবু বিক্রি হবো না।'

এবং এটাই লাচির শেষ সিদ্ধান্ত।

জিনাবাঈ তাকে বুঝালো, 'পঞ্চাশ হাজার টাকা কম না। বোকামী করো না। রাজী হয়ে যাও এবং জীবনটা গুছিয়ে নাও।'

'তাই বলে গুলকে প্রতারণা করবো?'

'গুল জানতেও পারবে না।'

'এটাকে কি প্রতারণা বলে না, যেটা কেউ জানতেও পায় না? তা তোমার কি ধারণা? আমি নিজেও কি জানতে পাবো না, আমি কার সাথে কি প্রতারণা করছি!'

'এর মধ্যে প্রতারণার কি আছে? এটা তো একটা সাময়িক ব্যাপার, যেটা জেলের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তার-পর জেলের সাজা ভোগ করে তুমি যখন বেরুবে, তখন এই পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারবে। গুলকেও তার অংশীদার বানাতে পারো।'

কিন্তু গুলকে কি বলবো? যদি জিজ্ঞেস করে এ টাকা কোথায়

পেয়েছো ?'

'তোমার যেটা খুশী ! বলো না লটারীতে পেয়েছি কিম্বা সত্য কথাই বলে দাও। তারপর দেখবে, গুলের চোখ জোড়া, তোমার নিঃস্বার্থ প্রেমিক গুলের চোখ জোড়াও এই টাকাগুলো দেখে কেমন ছানাবড়া হয়ে যায়। এবং তোমার অকৃতজ্ঞতার কথা তোমার নিজের মুখে শুনেও কেমন সুন্দরভাবে তোমার সাথে সমঝোতা করে নেয় দেখে নিও।'

'না না, সে তা করবে না।'

'বাজি ?'

'না। আমি বাজি ধরতে রাজী নই। তার প্রতি আমার বিশ্বাস নেই, তা তো নয়। বিশ্বাস আছে, এবং সে বিশ্বাসের পরিবর্তনও হবে না। আমি জানি……গুল আমারই। কিন্তু তাই বলে কেন খামাখা বাজি ধরে ফালতু কাজ করবো।'

'এর মধ্যে ফালতু কাজ কি হলো ? তুমি শরীরের মালিক—এই শরীর তোমার। অন্য কারো তো নয়—আর প্রেম মোহব্বত তো একটা বেকার জিনিস। এই আছে এই নেই। জীবনে দশবার প্রেম হয়, বিশবার ভাঙ্গে। চল্লিশবার আবার হয়। আমি নিজে যৌবনকালে কতবার যে প্রেম করেছি তার কোন হিসেব নেই। প্রথম প্রেম একটু পুরনো আর বাসী হতে না হতেই আমি সে প্রেমের দরোজাই বন্ধ করে দিয়েছি এবং নতুন প্রেমের দরোজা খুলে দিয়েছি।'

'বাহ !' লাচি বড় রাগ করে বললো, 'ওটা নারীর প্রেম নয়, মিউনিসিপ্যালিটির টেপ, যখন মন চাইলো টেপ ঘুরিয়ে পানি পান করে নিলাম, এবং মন চাইলো টেপ ঘুরিয়ে পানি বন্ধ করে দিলাম।'

জিনাবাঈ লাচির কথায় লাজবাব হয়ে চলে গেলো।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বার বার, বিভিন্ন অজুহাতে, বিভিন্ন দিক দিয়ে লাচির সামনে পেশ করা হলো।

কিন্তু লাচির একই জবাব, এখানে জিদেরও কোন প্রশ্ন নেই। লাচির এই জবাব মূলতঃ তার শরীর আর মনেরই জবাব, পরিপূর্ণ

ব্যক্তিত্বেরই জবাব। এ ছাড়া অন্য কোন জবাব তার নেই।

কখনো কখনো যুক্তির দিক দিয়ে সে লাজবাব হয়ে যায়। হার স্বীকার করে। কিন্তু পর মুহূর্তেই রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় তার সারা শরীর মন বিষিয়ে উঠে এবং ক্রোধান্বিত হয়ে সে বলে উঠে, 'না না, আমার অমতে যে আমাকে স্পর্শ করবে, তাকে আমি কাঁচা খেয়ে ফেলবো।'

সে আর কি কাঁচা খাবে. জেলে এমন এমন ঘাগুও আছে যারা লাচির ঘাড়ে ছোরা তার মান-ইজ্জতকে পদদলিত করতে পারে। কিন্তু হতভাগা খুব চান্দের জন্যে সবাই ওকে ভয় করে। খুব চান্দ থাকতে কেউ লাচিকে জালে ফাঁসাতে পারবে না। বড় জোর যদ্দুর করা সম্ভব. তাই করা হচ্ছে এখন।

জেলখানায় লাচির দিন দিন এক এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হতে লাগলো। একদিন তার সাথে গঙ্গাবাঈর পরিচয় হলো। যুবতী আর খুব সুন্দরী মারাঠী মেয়ে। নাম তো গঙ্গাবাঈ, কিন্তু ঔদ্ধত্য আর চঞ্চলতায় অনেক ঘাগু পুরুষকেও হার মানায়। হতভাগীর বুকের এক জোড়া নরম মাংসপিণ্ড সব সময় কেবল নাচতে থাকে।

তার বিরুদ্ধে প্রায় দু'ডজন চুরীর অভিযোগ আনা হয়েছে।

'তুমি কি মুরগীও চুরি করেছিলে?' লাচি ওকে জিজ্ঞেস করলো।

গঙ্গার মুখ থেকে একটা হাসির ফোয়ারা বের হয়ে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো। তার রূপোর মতো হাসির ঢেউ অনেকক্ষণ আকাশে-বাতাসে গুঞ্জন তুললো। বড় কষ্টে হাসি বন্ধ করতে করতে বললো, 'না, আমি কাপড় চুড়ি করেছিলাম।'

'কিভাবে?'

'আমার সাথে দু'জন পুরুষও কাজ করতো। আমাদের তিন-জনের এলাকাও ছিলো আলাদা। আমরা গভীর রাতে বড় বড় দোকানে প্রবেশ করতাম। এবং খুব সাবধানে শোকেসের কাচ ভাঙ্গতাম। তারপর ভেতরে ঢুকে চুরী করতাম। পুরুষ দু'জন বাইরে থাকতো। আমি

ভেতরে গিয়ে প্লাষ্টিক মডেলের শরীর থেকে শাড়ী খুলে নিতাম। শোকেসে সাজানো অন্যান্য থান কাপড়ও বের করে বাইরে ছুঁড়ে দিতাম।'

'যদি কোন পুলিশ এসে পড়তো?'

'তাহলে পুরুষগুলো এদিক ওদিক পালিয়ে যেতো। আর আমি শোকেসের ভেতরে ঢুকে অবিকল প্লাষ্টিকের মডেলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতাম। তখন পুলিশঅলারাও আমাকে প্লাষ্টিক মডেল মনে করে চলে যেতো।'

এ কথা শুনে লাচি খুব হাসলো। এই বুদ্ধিটা তার খুব পছন্দ হলো, 'বড় চমৎকার বুদ্ধি। খুব কম লোকই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু পুলিশও শেষ পর্যন্ত ধরে ফেললো আমাকে।'

'জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে?'

'আবার এই কাজ শুরু করবো।'

'তাহলে শাস্তি ভোগ করে কি লাভ হলো?'

'শাস্তি তো অপরাধের জন্যে সাময়িক বিরতি মাত্র।'

গঙ্গা চিন্তা করতে করতে বললো, 'এছাড়া অন্য কোন রাস্তাও তো নেই।'

'বিয়ে করোনি তুমি?'

'যে দু'জন পুরুষের সঙ্গে কাজ করি, তাদের দুজনকেই ধরতে গেলে বিয়ে করে রেখেছি আমি।'

'দুজনকেই?' লাচি আশ্চর্য হয়ে বললো।

'হ্যাঁ, দুজনকেই। কিছুটা ইতস্ততঃ করে বললো গঙ্গা। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে থাকলো সে।...এবং এখন তার মনে আবারো সেই প্রফুল্লতা ফিরে এলো। সে বললো, 'তবে ওরা দুজন আমাকে খুব খুশী রাখে।'

মুহূর্তের জন্যে লাচি ভাবলো, জেল থেকে বেরিয়ে কিছুদিনের জন্যে সেও এই পেশা গ্রহণ করবে। এ জাতীয় চুরি করার জন্যে তার মনে বড় ইচ্ছে জাগলো। মাঝে মধ্যে এ জাতীয় বিপদের সম্মুখীন হতে তার খুব ভালো লাগে। কিন্তু সেই যে দুই পুরুষের কাহিনী, ওটা লাচির একদম অপছন্দ।

সে যখন অন্যান্যদের সাথে সব বিপদ-আপদের অংশীদার হয়ে সমান সমান কাজ করে, তখন চুরি ছাড়াও নিজের সতীত্বও অন্যের হাওলা করে দেয় এটা মনে করাই তো স্বাভাবিক। তা না হলে তো ওটা দান্দালী হবে, পরস্পর আর অংশীদার হবে না।

কৌশল্যাকেও লাচির বড় অদ্ভুত মনে হলো।

কৌশল্যার কয়েকটি নাম আছে। ইকবাল বানু, সুরজিত কাউর, মেরী ডি সুজা আরো কি কি যেন। মেয়েটি গ্রেজুয়েট। ইংরেজী ছাড়াও উর্দু, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মারাঠি, বাংলা, ফরাসী, তামিল ও মালয়ালাম ভাষায়ও কিছুটা জ্ঞান রাখে। বড়ই আপটুডেট আর ফ্যাশানেবল মেয়ে কৌশল্যা।

গ্রেফতার হবার আগেও তার ধান্ধা ছিলো, চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন বেকার যুবকদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে নেয়া। বিভিন্ন মন্ত্রী আর অফিসারদের কাছে তার প্রচুর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে কৌশল্যা বেকারদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে নিতো। এবং টাকা আদায় করেই কেটে পড়তো। এ পর্যন্ত দু-তিনশ যুবক-যুবতীকে প্রতারণা করে হাজার হাজার টাকা মেরে নিয়েছে সে।

লাচি জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু তুমি তো পড়ালেখা জানা মেয়ে। কোথাও চাকরী করে হলেও দু-তিনশ টাকা সম্মানের সাথে রুজি করতে পারো।'

'দু-তিনশ টাকায় আমার পুরো খরচ হয় না।'

'তাহলে খরচ কমিয়ে দাও।'

'খরচ কমানো যায় না।'

'কেন যায় না?'

'আমি খুব ভালো জীবন যাপন করতে চাই।'

'ভালো জীবন কাকে বলে?'

'ভালো জীবন, খুব ভালো আর খুব বেশী টাকার বিনিময়েই

পাওয়া যায়।'

'টাকা—টাকা—টাকা। টাকা ছাড়া কি পৃথিবীতে সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না?'

'এ পৃথিবীতে মেয়েদের জন্যে সুখ-শান্তি আছেই বা কোথায়!' কৌশল্যা ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, 'আমার মা-বাবা টাকার লোভে এক বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিলো আমাকে। বুড়ো মারা গেলে, বুড়োর প্রথম পক্ষের বউ আর ছেলেমেয়েরা আমাকে বাড়ী থেকেই বের করে দিলো। ওরা যখন আমাকে প্রতারণা করেছে, তখন আমি অন্যকে প্রতারণা করলে কি এমন পাপ হয়ে যাবে শুনি! আমিও তো লক্ষ লক্ষ বার চেয়েছি কোন ভালো ছেলে আমাকে বিয়ে করুক; যাতে আমিও ধর্মমতে এবং আইনসম্মতভাবে নিজের সতীত্বটাকে তার হাতে বিক্রি করে দিয়ে আরামে আর শান্তিতে জীবনটা কাটাতে পারি। কিন্তু কোন ভালো ছেলেই আমাকে বিয়ে করতে রাজী হলো না।'

'বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটাকেও তুমি বেচা-কেনা বলছো?'

'বিয়েতে মেয়েরা ধরতে গেলে নিজের শরীরই বিক্রি করে। এছাড়া আর কি!'

'তাহলে কি প্রেম-ভালোবাসা বলতে কিছুই নেই?'

'আছে হয়তো।'

কৌশল্যা বড় তিক্তস্বরে বললো, 'আমি তো পাইনি।'

লাচি চিন্তাভাবনা করে বললো, 'আমি তো বলি তুমি এতো ভালো মেয়ে যে, তোমাকে যে কোন ভদ্রছেলেই বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে। যদি তুমি তাকে এসব প্রতারণার কথা না বলো।'

'যে ছেলেকে আমি বিয়ে করবো, তাকে এসব কথা কি করে না বলি? তাকে তো সব কথাই খুলে বলতে হবে। আর যখন আমি এসব কথা খুলে বলি, এবং প্রতিবারই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি যখন ঠিক করি যে, এবার থেকে ঠিকমতো চলবো এবং কোন ভালো ছেলেকে বিয়ে করে নেবো, তখনই সেই ভালো ছেলে আমার এসব কথা শুনে বেঁকে বসে।'

'ভালো ছেলে বলতে তুমি কি বুঝাচ্ছো?' লাচি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'এমন ছেলে যার মাসিক আমদানি কমপক্ষে এক হাজার টাকা।'

'আরে……!' হঠাৎ লাচির মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, 'তাহলে তো সত্যিই কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

কৌশল্যা ওরফে ইকবাল বানু ওরফে সুরজিত কাউর এক অদ্ভুত কায়দায় মাথার চুলগুলো ঝাঁকি দিলো। যেন পৃথিবীর কাউকেই সে পরওয়া করে না। পরে পুরুষ জাতটার প্রতি একটা শক্ত গালি দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিজের কুঠরীতে চলে যেতে লাগলো।

আজ লাচির মন-মস্তিষ্কে হাজারো চিন্তার ভিড়। যখন ঘাগরা পরে হাতে দাফ নিয়ে খুব চান্দের সামনে টুলের উপর গিয়ে দাঁড়ালো, তখন তার চেহারায় সেদিনের সেই আনন্দ উল্লাসের লেশ মাত্রও নেই। আজ তার চেহারা একরাশ চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত। খুব চান্দ ছবি আঁকতেই মগ্ন। হঠাৎ এক সময় লাচি জিজ্ঞেস করলো, 'সুপরিটান!'

'হ্যাঁ, লাচি।'

'টাকার বিনিময়েই যদি সুখ-শান্তি পাওয়া যায়, তাহলে এক টাকাতে পাওয়া যেতে পারে, আবার এক হাজার টাকাতেও, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, লাচি।'

লাচি কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। পরে বললো, 'সুপরিটান!'

'হ্যাঁ, লাচি।'

'তুমি কি ভালো লোক?'

'মানে?'

'মানে তোমার বেতন কত?'

'ছ'শ টাকা।'

'তাহলে তো তুমি ভালো লোক নও।'

খুব চান্দের হাত থেমে গেলো। তিনি লাচির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কেমনতরো চিন্তা? তোমার সাথে কি আমি কোনদিন অভদ্রতা করেছি?'

'না! কিন্তু কৌশল্যা বলে, যার আমদানি কম পক্ষে এক হাজার টাকা, সেই নাকি ভালো লোক।'

খুব চান্দ হাসলেন। বললেন, 'কৌশল্যা যা বলে, পৃথিবীর আর সবাইও তাই বলে। এবং এ কারণেই পৃথিবীতে ধোকাবাজি হচ্ছে, প্রতারণা চলছে।'

লাচি চিন্তা-ভাবনা করে আবার বললো, 'সুপরিটান!'

'হ্যাঁ, লাচি।'

'তাহলে যে লোক এক হাজার টাকা রুজি করে, সে কি প্রতারণা করে না?'

'করে, প্রতারণা করে। বরং সে আরো বেশী প্রতারণা করে।'

'তাহলে ভদ্রতা কি?'

'বড় কঠিন প্রশ্ন করেছো তুমি, লাচি।'

খুব চান্দ লাচির কাছে গিয়ে বললেন।

পরে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে আবারো বললেন, 'তোমার প্রশ্নের জবাব এই চিঠির মধ্যেই আছে।'

'এই চিঠি কি গুলের?' লাচি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ।'

এক লাফে টুল থেকে নেমে এলো লাচি। চিঠি নেয়ার জন্যে ছেলে মানুষের মতো অস্থির হয়ে খুব চান্দের কাছে ছুটে গেলো।

খুব চান্দও ছোট বাচ্চার মতো চিঠি নিয়ে দূরে সরে যেতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত লাচি খুব চান্দকে ধরেই ফেললো। এবং দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার কাছ থেকে চিঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে একটা চুমু দিয়ে দিলো। পরে তাকে জোর করে দু'হাতে তুলে নিয়ে টুলটায় বসিয়ে দিলো, যেটায় সে বসেছিলো। এবং নিজে গিয়ে ইজেলের পাশে দাঁড়ালো, তারপর ব্রাশ উঠিয়ে নিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে নাড়তে নাড়তে বললো, 'এক্ষুণি আমাকে গুলের চিঠি পড়ে শুনাও। তা না হলে এই ব্রাশ দিয়ে তোমার রঙের উপর পানি ছিটিয়ে দেবো।'

'আরে আরে! এরকম করো না, আমি এক্ষুণি চিঠি পড়ে শুনাচ্ছি।'

খুব চান্দ তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে ফেললেন। এবং চিঠি খুলে পড়তে লাগলেন।

লাচি দৌড়ে তার পায়ের কাছে বসে পড়লো। এবং তার হাঁটুর উপর চিবুক রেখে চিঠি শুনতে লাগলো।

খুব চান্দ বললেন, 'প্রাণাধিক প্রিয় লাচি।'

লাচি খুব চান্দকে মারার জন্যে হাত তুললো। খুব চান্দ বাধা দিতে দিতে বললেন, 'আরে পাগলী, এটা কি আমি বলছি! আমি তো গুলের চিঠি পড়ে শুনাচ্ছি।'

'আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু দেখো, ঠিক ঠিক পড়ে শুনাবে, নিজে থেকে কিছু বনিয়ে বলবে না। তা না হলে……'

খুব চান্দ চিঠি পড়ে শুনাতে লাগলেন……

'আমার হৃদয়ে সব সময়ই তোমার ছবি খেলা করে। আমার চোখে সব সময়ই তোমার ছবি ভাসে। প্রতিটি মুহূর্তেই আমার প্রিয়তমা লাচির মায়াময় চেহারা মনে পড়ে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আজীবন, আমৃত্যু আমার প্রিয় লাচিকে আমি ভালোবেসে যাবো।'

লাচি চোখ বন্ধ করে গুলের চিঠি শুনতে থাকলো। তার কাছে মনে হলো এসব শব্দাবলী কোন মামুলী শব্দাবলী নয়, বরং এক চুমুক মধু, যা আস্তে আস্তে তার হৃদয়কে ছুঁয়ে যাচ্ছে। নরম মোলায়েম রেশমের পালক, যার সাহায্যে সে এই বিশ্ব চরাচরের সুবিশাল শূন্যতায় উড়ে বেড়াচ্ছে।……

'গুল…গুল…গুল…আমার ফুল!'

পরের মাসে গুল লাচির সঙ্গে দেখা করতে এলে লাচি গুলকে ধরে খুব চান্দের প্রাইভেট কামরায় নিয়ে গেলো। এবং বড় গর্বের সাথে খুব চান্দকে দেখিয়ে বললো, 'এই আমার গুল।'

খুব চান্দ গুলের আপাদমস্তক দেখলেন। লম্বা, চওড়া, বিলাসী গুল চমৎকার দুটি চোখের অধিকারী।…গুরুগম্ভীর গুল যেন সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। মুহূর্তের জন্যে খুব চান্দ মনে মনে নিজের সাথে

তুলনা করে দেখলেন। পরে তার চেহারায় একটা ম্লান, অনেকটা যেন কান্না বিজড়িত হাসি ফুটে উঠলো। তিনি গুলকে বললেন, 'এসো এসো। এখানে বসো।'

লাচি বললো, 'আর এ আমাদের সুপরিটান।.....বড় ভালো মানুষ। তার মেহেরবানীতেই আমরা এখানে মিলিত হবার সুযোগ পাচ্ছি। তা না হলে আমাকে লোহার জালির ঘেরাওর মধ্যে পেতে।'

গুল সকৃতজ্ঞ নয়নে খুব চান্দকে দেখলো। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলো না। তবে তার অস্থির হাত জোড়া অবশ্যই জানান দিচ্ছিলো, সে যে কোন কারণেই হোক বড় চিন্তিত।

খুব চান্দ তার নীরবতা আর হাতের অস্থিরতা দেখে ধীরে ধীরে ব্রাশটা ছোট্ট পানির পেয়ালায় ধুয়ে-মুছে একদিকে রেখে দিলেন। তারপর দৃষ্টি জোড়া নীচের দিকে ঝুকিয়ে ধীরে ধীরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খুব চান্দ বেরিয়ে যেতেই লাচি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। ছুটে গিয়ে গুলের বুকের সাথে লেপ্টে গেলো। সে তার পেশোয়ারী টুপী খুলে একদিকে আলাদা করে রাখলো। এবং পরে তার চেহারাটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রথমে গালে ছোঁয়ালো, পরে অনুযোগ মাখা স্বরে বিড়বিড় করতে করতে বললো, 'গুল গুল—! তুমি গত মাসে আমার সাথে দেখা করতে আসোনি। কেন?'

গুল চুপ থাকলো।

তার অস্থির হাত জোড়া একবার লাচিকে ধরছিলো, আবার ছেড়ে দিচ্ছিলো। তার বুকের সাথে লেপ্টে থাকা লাচি গুলের বুকের আওয়াজ শুনছিলো। আস্তে আস্তে গুলের হাত লাচির কোমরের উপর গিয়ে স্থির হলো। পরে এক ঝটকায় তাকে টেনে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলো, পর মুহূর্তে আবার ছেড়ে দিলো। এবং মাথা নত করে লাচির কাছ থেকে আলাদা হয়ে বসে পড়লো।

'গুল, কি ব্যাপার?'

চকিতে লাচি গুলের কাছে চলে এলো। এবং তার মুখ নিজের দিকে ফেরাতে ফেরাতে বললো, কি ব্যাপার, বলবে না?'

গুল বললো, 'আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়নি।'

'কোন দরখাস্ত?'

'ভারতীয় নাগরিক হবার দরখাস্ত।'

লাচি আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠলো।

'মঞ্জুর হয়নি তো কি হয়েছে? এতে মুখ কালো করার কি আছে! আমাদের দেখ, আমরা যাযাবররা কোন জায়গারই না। যেখানে মন চায় চলে যাই।'

'তোমাদের কথা আলাদা, আমি পাঠান। আমি পাকিস্তানের বাসিন্দা। আমার দেশ পাকিস্তান।'

'দেশ কি?' লাচি জিজ্ঞেস করলো।

'দেশ...' বলতে বলতে থেমে গেলো গুল।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে বুঝি নিজেকেই প্রশ্ন করলো গুল, 'সত্যই তো, দেশ কি?' এবং পরে যখন নিজের কাছেই কোন জবাব পেলো না তখন থেমে থেমে বললো গুল, 'দেশ, বাস দেশ। যে রকম একটা দেশ পাকিস্তান, একটা দেশ হিন্দুস্থান, চীন, জাপান। এসব দেশ পৃথিবীর আলাদা আলাদা একটা অংশ।'

'কিন্তু আমাদের যাযাবরদের জন্যে তো গোটা পৃথিবীটাই এক।'

'কিন্তু এই পৃথিবীর মানুষদের জন্যে এক নয়।' গুল কিছুটা তিক্তস্বরে বললো, 'যারা নিজেদের ভদ্র আর প্রগতিশীল বলে দাবী করে, তারা এই পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। এবং আলাদা আলাদা দেশে পরিণত করে দিয়েছে। এটা তোমার দেশ, ওটা আমার দেশ এবং সেটা তার দেশ।'

'কিন্তু তুমি তো আমার।'

লাচি নিজের দু'হাত দিয়ে গুলের চারপাশ অতি আপন-জনের মতো পরিবেষ্টন করে বললো, 'তুমি স্রেফ আমার। কোন দেশের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি একজন গরীব যাযাবর মেয়ে। ওসব বড় বড় কথা আমি বুঝি না। তোমার দরখাস্ত যদি মঞ্জুর না

হয় তো কি হয়েছে, আল্লা মিয়া তো আমাদের প্রেমের দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।'

'এখন তোমাকে কি করে বুঝাই লাচি ?'

গুল অস্থির হয়ে বললো, 'এই দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়া মানে এখন থেকে আমি আর হিন্দুস্থানে থাকতে পারবো না। তোমার সাথে প্রত্যেক মাসে আর দেখা করতে পারবো না। সাজা ভোগ করার পর যখন জেল থেকে বেরুবে তখন আর আমার চেহারাও দেখতে পাবে না তুমি !'

'না—না।' লাচি চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'তুমি তা করতে পারো না, তা করতে পারো না। কেউ আমার গুলকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

লাচি গুলকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলো। এবং তার শরীরের সাথে লেপ্টে থেকে বসে পড়লো।

এক সময় তার চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সে গুলকে বললো, 'না না, তুমি মিথ্যা বলছো—তুমি আমাকে এমনি এসব কথা বলছো। আমার সাথে ঠাট্টা করছো তুমি। বলো না গুল, এসব মিথ্যে, ঠাট্টা ?'

গুল মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে থাকলো। অনেকক্ষণ পর যখন সে মাথা তুললো, লাচি দেখলো গুলের চোখেও অশ্রুবন্যা।

'আমরা সুদখোর পাঠান। বছরের পর বছর ধরে আমরা এদেশে এই ব্যবসাই করে আসছি। এ পর্যন্ত কেউ বাধা দেয়নি, ফলে আমার বাবা হিন্দুস্থানী নাগরিক হবার কথা চিন্তাও করেনি কোন-দিন। আমিও চিন্তা করিনি। আমরা বছর দু'বছর পর নিজেদের দেশে যেতাম, ক'মাস থেকে আবার ফিরে আসতাম। এটাই ছিলো আমাদের ব্যবসাস্থল, তবে দেশ ছিলো অন্যটা।.....কিন্তু এখন অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে।...আগে এটা ছিলো একটা দেশ। এখন হয়েছে দু'টো দেশ। এখন পাকিস্তান একটা আলাদা স্বাধীন দেশ, হিন্দুস্থান অন্য দেশ, পৃথক এবং স্বাধীন। আইন-কানুনও বদলে গেছে...সুদখোরীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যার

দরুন আমার বাবার ব্যবসা কিছুটা মন্দা যাচ্ছে। বাবা তো এখন পাকিস্তান চলে যাচ্ছে। সে তো কোনদিন হিন্দুস্থানী নাগরিকত্ব নেয়ার কথা চিন্তা করেনি, আমিও এর আগে কোনদিন চিন্তা করিনি.....কিন্তু আগে তো তুমি ছিলে না। তাই চিন্তাই বা কেন করবো!—তোমাকে যখন থেকে ভালোবাসতে শুরু করি, তখন থেকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা চিন্তা করি। এ কারণে আমি হিন্দুস্থানী নাগরিকত্বের দরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু আমি বড্ড দেরী করে ফেলেছি, ওরা আমার দরখাস্ত অনুমোদন করেনি। ওরা আর আমাকে এখানে থাকতে দেবে না।'

'তুমি ওদের বলতে, আমার লাচি এখানে থাকে। আমি এখান থেকে কি ভাবে যাই?'

'ওরা ভালোবাসা বুঝে না, স্রেফ ঘৃণা বুঝে।'

'তুমি বলতে, এই পৃথিবী তো খোদারই।'

'যদিও এই পৃথিবীতে মন্দির, মসজিদ, গির্জা অনেক আছে, কিন্তু সত্যি বলতে একখণ্ড মাটিও খোদার নেই।'

'আমি তোমাকে যেতে দেবো না।' হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বলে উঠলো লাচি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মনটা চিন্তান্বিত হয়ে উঠলো।—কিছুক্ষণ পর গুলকে নিজের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলো। এবং দু'হাতে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কেন কাঁদছো লাচি?—কে জানে কবে থেকে, আজ থেকে নয়, বোধ হয় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর থেকে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে, যেদিন থেকে মানুষের জন্ম, মনুষ্যত্ব এভাবে কাঁদছে এবং প্রেম ভালোবাসা বিলাপ করছে। মানুষ তো মুখে অনেক বলে মনুষ্যত্বের কথা, ভালোবাসার কথা, সৌন্দর্যের কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা, পূত-পবিত্রতার কথা।.....নেতারা গালভরা বুলির মাধ্যমে, সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনার মাধ্যমে, দার্শনিকরা সারা-জীবন চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব, প্রেম-ভালোবাসা আর ভ্রাতৃত্ব-বোধের অনেক দোহাই দিয়েছে...কিন্তু ভালোবাসার অশ্রুকে মুছতে পেরেছে কি? মনুষ্যত্বকে কি আশ্রয় দিতে পেরেছে? পূত-পবিত্রতাকে

কে সম্মান দিতে পেরেছে? সৌন্দর্যকে কে বরণ করে নিতে পেরেছে? এরা সবাই ভালোবাসার আড়ালে ঘৃণা, মনুষ্যত্বের বেশে হিংস্রতা, সৌন্দর্যের আড়ালে কুশ্রীতা এবং পবিত্রতার নামে অপবিত্রতাকেই শুধু ছড়াচ্ছে আর সভ্যতার ঝাণ্ডা উঁচু করছে। সভ্যতা? এসব মানুষের চাইতে বরং জলহস্তীদের কাছেই সভ্যতা অনেক বেশী দেখা যায়।

গুল ধীরে ধীরে বললো, 'সাত দিনের মধ্যে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

লাচি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

গুল লাচির চোখের অশ্রু মুছে দিলো না। স্রেফ হাতের পিঠ দিয়ে নিজের অশ্রুরোধ করার চেষ্টা করলো। তার নীচের ঠোঁটটা কেঁপে কেঁপে উঠলো। বড় কষ্ট করে নিজের দু'টি হাত মুষ্টিবদ্ধ করলো সে। এবং পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

'আচ্ছা লাচি, আমি যাচ্ছি।'

লাচি ওর পা ধরে ফেললো, 'যেও না গুল, যেও না, কোথাও যেও না।'

গুল জোর করে এক পা সামনের দিকে বাড়ালো আরেক পা— আরেক পা। লাচিও তার সাথে সাথে কাঁদতে কাঁদতে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে সামনের দিকে চলে এলো।

'যেও না আমার গুল, যেও না।' লাচি কাঁদতে কাঁদতে বললো।

শেষবার অনেক কষ্ট করে গুল লাচির বন্ধন থেকে পা জোড়া মুক্ত করে নিলো এবং ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

লাচি ওখানে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকলো।

অনেকক্ষণ পর খুব চান্দ ভেতরে এলেন।

তিনি লাচিকে মেঝে থেকে তুললেন। তার অশ্রু মুছে দিলেন এবং মাথাটা নিজের কাঁধে রাখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'গুল চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

লাচি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললো, 'গুল চলে গেছে। আর কোন দিন আসবে না।'

'গুল আমাকে সবকিছু বলেছে। কিন্তু সে বেচারার কি দোষ? দোষ পরিস্থিতির, দোষ যুগের···তবে তুমি কোন চিন্তা করো না লাচি। গুল চলে গেছে তো কি হয়েছে, আমি তো আছি···আমি তোমার দেখা-শুনা করবো। জেলে তোমার কোন রকমের কষ্ট হতে দেবো না···জেলের সাজা ভোগ করে তুমি যখন মুক্ত হয়ে যাবে, তখন আমিও জেলের এই চাকরী ছেড়ে দেবো; তোমাকে বিয়ে করে নেবো। তারপর তোমাকে প্যারিস নিয়ে যাবো, এবং—এবং পৃথিবীকে এমন একটি মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ ছবি উপহার দেবো, যার সৃষ্টির পেছনে তোমার সমস্ত রূপ-সৌন্দর্যকে উজাড় করে দেবো।'

এ কথায় লাচি হঠাৎ খুব চান্দের কাঁধ থেকে নিজের মাথা সরিয়ে নিলো। তার শিথিল শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। সে খুব চান্দের কাছ থেকে আলাদা হয়ে এক দিকে বসে পড়লো। এবং চোখের অশ্রু মুছে ফেললো। তারপর নির্ভয়ে খুব চান্দের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সুপরিটান!'

'হ্যাঁ, লাচি!'

'তুমি কি কোন রকমেই আমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারো না?'

'না লাচি! যে যতটুকুন অপরাধ করে সে ততটুকুনই শাস্তি পায়।'

'তাহলে আমি কিভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেতে পারি?'

'যদি তুমি দ্বিতীয়বার কাউকে খুন করতে পারো···'

'তাহলে আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েই আবার খুন করবো। আবার খুন করবো—আবার খুন করবো—এবং যে পর্যন্ত আমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না দাও, ফাঁসিতে না চড়াও, সে পর্যন্ত আমি মানুষ খুন করতে থাকবো।'

'তুমি এসব চিন্তা করো কেন লাচি?'

'এজন্যে যে, তোমাদের সবাইকে খুন করা উচিত।' লাচি রাগান্বিত হয়ে বললো।

তারপর উঠে দাঁড়ালো এবং ইজেলের উপর রাখা নিজের অসমাপ্ত ছবির দিকে এগুলো সে, তারপর হাত বাড়িয়ে ছবিখানি নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলো।

'মেয়েদের ছবি আঁকার কি অধিকার আছে তোমার? কোনদিন ওদের মনের ভেতর উঁকি মেরে দেখেছো?···তোমরা সবাই কেবল ওদের চারদিকে লোহার বেড়ী দিতেই জানো। কিন্তু তুমি লাচিকে চেন না—আমি একজন স্বাধীন যাযাবর মেয়ে—আমার জন্যে কোন দেশের জেল নেই, কোন জাতির চারদেয়াল নেই। আমি সব দেয়াল টপকে চলে যাবো, সব লোহার বেড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাবো। যদি কেউ আমার প্রেমের পথে বাধা দেয়, আমি চুরি করবো, পকেট মারবো, খুন করবো, ডাকাতি করবো। কিন্তু কখনো ···কেউ···আমার এ শরীরে হাত দিতে পারবে না, একমাত্র গুল ছাড়া।'

লাচি যেন আকাশের সুউচ্চ মিনার থেকে নীচে, মাটিতে বসে থাকা ক্ষুদ্র খুব চান্দকে দেখলো। তারপর রাজকীয় ভঙ্গীতে পা ফেলে এমনভাবে ধীরে ধীরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো যেন সে বাইবেলের শেষ বাক্য আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নিজের কর্তব্য সমাপন করে এখন বুঝি ক্রুশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আর খুব চান্দ ভাবলেন:

'লাচি কাগজের ছবি ছিঁড়লে কি আর মনের ছবি ছেঁড়া যায়? —বোকা প্রেমিকা, তোমার ছবি তো এখন চোখ বন্ধ করেও বানাতে পারি!'

কিন্তু তিনি লাচিকে কিছুই বললেন না। স্রেফ নীরবে ছবির ছেঁড়া টুকরোগুলোকে দেখতে থাকলেন।

মাস কয়েক পর খুব চান্দ যখন লাচির সহযোগিতা ছাড়াই তার নতুন ছবি এঁকে শেষ করলেন, তখন লাচি সে ছবি দেখে বললো,

'এ মিথ্যে।'

'কি মিথ্যে?' খুব চান্দ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি এতো সুন্দরী নই।'

লাচি ছবিটার দিকে তাকিয়ে স্বীকার করলো, 'পোশাকটা অবশ্য আমার, চেহারাটাও আমার। উচ্চতা, রঙ, গঠনাকৃতি সব আমার হওয়া সত্ত্বেও এই ছবি আমার নয়। এ রকম কেন সুপরিটান?' লাচি ছবি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে খুব চান্দকে জিজ্ঞেস করলো।

খুব চান্দের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। যে মুহূর্তের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন শেষ পর্যন্ত সে মুহূর্ত এসেই পড়লো।

তিনি কি বলবেন, না বলবেন না? এই ছবি তৈরী করতে করতে তিনি কয়েকবার ভেবেছিলেন, বলেই ফেলবেন।

আবার ভেবেছিলেন, কেন বলবো? নীরবতারও তো একটা ভাষা আছে, দৃষ্টিও তো কিছু বলে। তার কম্পিত আংগুল থেকে যে সুমধুর সঙ্গীত ছুটে বেরোয়……তা কি সে শুনতে পায় না?

আমি তোমার ছবির মাধ্যমে অনেক কিছু বলে ফেলেছি লাচি! তবুও তুমি শুনতে পাও না কেন?

তুমি কি এর মধ্যে কেবল নিজের ব্যক্তিত্বটাই দেখতে পাও? নিজের চেহারার প্রতিফলন, রূপ-যৌবন আর আকৃতি-প্রকৃতি? আমার হৃদয়ের সৌন্দর্য কেন তোমার চোখে ধরা পড়ে না?……

আরে তুমি কেমনতরো মেয়ে?—আমার মনের আনন্দটা কি একেবারেই অনুভব করতে পারো না তুমি? তোমাকে আর কি বলবো?

খুব চান্দ নীরবে লাচির ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, মুখে কিছুই বললেন না।

তিনি লাচির কোন প্রশ্নেরই জবাব দিলেন না।

তার মুখ দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাসও বেরুলো না।

চোখ দিয়েও তার কোন অশ্রু গড়িয়ে পড়লো না।

ব্যস নীরবে শুধু দু'টি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে ছবিটির সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন।

এক সময় লাচি হঠাৎ খুব চান্দের অতি নিকটে চলে এলো। ধীরে

ধীরে খুব চান্দের কাঁধের উপর হাত রেখে অতি দুর্বল স্বরে মোলায়েম কণ্ঠে বললো. 'আমি যদি গুলকে ভালো না বাসতাম তাহলে তোমারই হয়ে যেতাম সুপরিটান!'

মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠলেন খুব চান্দ। তার মুষ্টিবদ্ধ হাত খুলে গেলো। তার সারা শরীর ঝড়ে পাওয়া পাতার মতো কেঁপে উঠলো এবং কাঁপতে কাঁপতে এক সময় নীরব নিথর হয়ে গেলো। যেন ডালপালা থেকে পাতা ঝরে গেছে। এবং তীব্র বাতাসের ঝটকায় দূরে কোথায়ও হারিয়ে গেছে—মৃত্যুর গহ্বরে যেন আজীবনের জন্যে মুখ লুকিয়েছে।.....

'কিন্তু গুল তো চলে গেছে। ও আর কখনো ফিরে আসবে না।'

খুব চান্দ লাচির দিকে না তাকিয়েই বললেন। যেন তিনি লাচিকে নয়, তার ছবিকেই বলছেন।

'ফিরে না এলে কি হবে? আমি তো তার কাছে যেতে পারি। আমি তো যাযাবর মেয়ে, সুপরিটান! আমার কোন বাড়ী নেই, কোন দেশ নেই। কোন দেয়াল নেই, কোন জেল নেই। আমি যে কোন জায়গায় যেতে পারি। আমি ভীরু নই। আমি একা পায়ে হেঁটে গুলের কাছে পৌঁছে যাবো। চাই কি সে পাঁচ হাজার মাইল দূরে থাক না।'

'আমি ভেবেছিলাম...' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন খুব চান্দ।

'কি ভেবেছিলেন?'

'ভেবেছিলাম, চাকরী ছেড়ে দেবো। তোমাকে নিয়ে প্যারিস চলে যাবো এবং ওখানে একটা ষ্টুডিও খুলে স্রেফ তোমার ছবিই আঁকবো।'

'স্রেফ আমার কেন?'

'কারণ কখনো কখনো একটা ব্যক্তিত্বও এক একটা সমুদ্রের মতো হয়ে থাকে।'

'আমি বুঝলাম না।'

লাচি অবাক হয়ে বললো।

খুব চান্দ তার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, 'এমন তো নয়

যে, তুমি কিছু শুননি, কিছু বুঝনি। তা আমি না বলতেই যখন তুমি এতো কিছু বুঝে ফেলেছো, তখন এ সামান্য কথাটাই বা তোমার বুঝে আসে না কেন···আর যদি তুমি নিজে নাই বোঝ তাহলে আমি বললেই বা তুমি বুঝবে কি করে? এতে দুটি কথাই প্রমাণ করে। মনের কথা মনই বুঝে। কিন্তু একটি মন আর একটি মনের ভেতর এমন ভাবে বিলীন হয়ে যেতে পারে না, তাতে অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করে! আহাঃ কত বড় নিঃসঙ্গতা··· !'

লাচি বললো, 'তুমি সব সময় হয় কিছু প্রমাণ করতে লেগে যাও, নতুবা ছবি বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ো,—আর আমি স্রেফ কামনা করি···সুপরিটান! স্রেফ কামনা করাটাই কি যথেষ্ট নয়?'

খুব চান্দ লাচির দিকে এক পা এগিয়ে এলেন। হঠাৎ তার মন চাইলো লাচিকে নিজের দু'বাহুতে জড়িয়ে নেন।

কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি থেমে গেলেন। এবং নিজের দু'বাহু শক্ত করে আপন বুকের উপর জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'অনেক সময় কামনা কেন, কারো জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়াও যথেষ্ট নয়।'

'আহা, তুমি কতো সুন্দর কথা বললে।'

লাচি সপ্রশংস দৃষ্টিতে খুব চান্দের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ব্যস এ কথাটাই আমি সব সময় গুলের জন্যে চিন্তা করি, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না।'

খুব চান্দ নীরব নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

লাচি মুখ ফিরিয়ে ছবিটা দেখতে লাগলো। বললো, 'এখন তুমি ছবিটা কি করবে?

'আমি এটা সঙ্গে করে প্যারিস নিয়ে যাবো।'

এক সময় হঠাৎ খুব চান্দের মনে হলো, এখন তার কিছু একটা করা উচিত। হয় ঝগড়া করে লাচিকে কামরা থেকে বের করে দেয়া, কিম্বা জোর করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরা। অথবা নিজের চুল হলেও সব ছিঁড়ে একাকার করে দেয়া উচিত। তা না হলে ক্রমশ, বাড়তে

থাকা দুশ্চিন্তা তাকে পাগল করে দেবে।

খুব চান্দ ছোট্ট একটা আলমারীতে চাবি লাগালেন। এবং ভেতর থেকে সেন্টের ছোট ছোট দু'তিনটা শিশি বের করলেন। তারপর ছবির গায়ে সেন্ট লাগাতে লাগলেন—বিভিন্ন সেন্ট চুলে, ঘাড়ে ও ঘাগরায় ছিটাতে লাগলেন।

'কি করছো?' লাচি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'ছবিতে সেন্ট লাগাচ্ছি।'

লাচি বললো, 'বড় অদ্ভুত লোক তুমি···প্যারিস যেতে যেতে তো সুগন্ধ চলে যাবে।'

'কিন্তু তার স্মৃতি তো থাকবে···'

খুব চান্দ লাচির দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'লাচি, কোন জিনিসই কখনো শেষ হয় না। বরং অন্য জিনিসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সৌন্দর্য স্মৃতিতে, স্মৃতি সঙ্গীতে, সঙ্গীত গুঞ্জনে, গুঞ্জন পরিবেশে, পরিবেশ তরঙ্গে···এবং তরঙ্গকে কে নিশ্চিহ্ন করতে পারে বলো?'

লাচি একটা শীতল নিঃশ্বাস টেনে বললো, 'ভাগ্যের লিখন কে মুছতে পারে? আমার এখন গুলকে মনে পড়ছে।'

'গুল—! গুল—! গুল—!' হঠাৎ খুব চান্দ জোরে চীৎকার দিয়ে উঠলেন, 'সব সময় কেবল গুল! গেট আউট!'

'কিন্তু সুপরিটান!'

খুব চান্দকে এভাবে বিগড়ে যেতে দেখে লাচি ভয় পেয়ে গেলো।

'গেট আউট!' খুব চান্দ দু'হাত প্রসারিত করে জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

লাচি ভয় পেয়ে ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

পথে দু'তিনজন চাপরাশী লাচিকে খুব চান্দের কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখলো।

একজন চাপরাশী জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?'

লাচি বড় ক্লান্তস্বরে বললো, 'কি আর হতে পারে? তুমিই বলো, একজন পুরুষ যদি একজন নারীকে চায়, আর সে নারী যদি

পুরুষটিকে না চায় তাহলে কি হতে পারে ?'

দিলারা জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে ?'

'ও আমাকে প্যারিস নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সব পুরুষই কেবল নিজের চাওয়াটাই চায়, নারী কি চায় সেটা আর দেখে না।'

'হায় প্যারিস !' কৌশল্যার মুখে পানি এসে পড়লো। ওর চোখে কামনা-বাসনা চক চক করতে লাগলো।

'ওকে বলো না আমাকে প্যারিস নিয়ে যেতে !'

অন্যান্য মেয়েরা খিল খিল করে হাসতে লাগলো।

কিন্তু লাচির মুখে হাসি যোগালো না। সে মাথা নত করে নিজের নিঃসঙ্গ কামরায় চলে গেলো।

তিন দিন পর্যন্ত লাচি নিজের কামরা থেকে বেরুলো না। এ তিনদিন সে জ্বরে শুধু ছটফট করতে থাকলো। এবং ডাক্তার এসে তাকে দেখে যেতে থাকলো আর ওষুধপত্র দিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু বেকার। লাচির জ্বর কেবল বাড়তেই থাকলো।

পঞ্চমদিন ডাক্তার বড় বিমর্ষ আর চিন্তান্বিত চেহারা নিয়ে লাচির কামরা থেকে বেরুলো। ওয়ার্ডার তার পেছনে পেছনেই এলো। বাইরে জিনাবাঈ, কালীচরণ আর খুব চান্দ দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডাক্তার তাদের প্রশ্নমাখা দৃষ্টির জবাব দিতে দিতে বললো, 'অবস্থা খুবই খারাপ। তাকে এক্ষুণি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

'জেল হাসপাতালে ?' খুব চান্দ জিজ্ঞেস করলেন।

'না', ডাক্তার ষ্টেথিস্কোপ ঝুলাতে ঝুলাতে বললো, 'তাকে সংক্রামক রোগের হাসপাতালে পাঠাতে হবে।'

'কেন ? সংক্রামক রোগের হাসপাতালে কেন ?' খুব চান্দ ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'তার গুটিবসন্ত দেখা দিয়েছে।'

হাসপাতালের জগত সে এক অন্ধকার জগত, ভীতিপ্রদ জগত। অর্থহীন প্রলাপ বকার দিন আর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা রাতের জগত। রক্ত, পুঁজ আর খোস-পাচড়ার জগত।

যেন একটা বিরাট গর্ত। রক্ত, পুঁজ আর কাদা মাটির গর্ত।

এবং সে যেন পায়ে পায়ে সেই গর্তের ভেতর ধ্বসে যাচ্ছে। আর চারদিকে একরাশ অন্ধকার। সে ভয়ার্তস্বরে চীৎকার দিয়ে গুলকে ডেকে ফিরছে। সে যখন চীৎকার দিয়ে উঠে তখন অন্ধকারের মধ্যে যেন কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ চমকে যায়। কোথাও কোথাও যেন মেঘ গর্জন করে যায়। এবং নিকষ অন্ধকারের মধ্যে কখনো গুল, কখনো কালীচরণ, কখনো খুব চান্দের ছায়া তার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠে। সাথে সাথে আবার মিলিয়ে যায়। চোখের সামনে তখন একরাশ অন্ধকার ছেয়ে যায়।

এক সময় চোখের পাতা খুলে সে তার যাযাবর মা-বাবাকে ডেকে ডেকে অস্থির হয়ে উঠে। শরীরের তাবৎ শক্তি সঞ্চয় করে গোত্রের সবার নাম ধরে চীৎকার দেয়। এবং খোদাকে—যে খোদা হয়তো সাত তবক জমিন আর সাত তবক আসমানের উপর এক অজানা জগতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। আর সে রাগে দুঃখে নিজের ঠোঁট জোড়া দাঁতে কাটতে থাকে। রক্ত, পুঁজ আর ময়লা আবর্জনায় তার সাদা মুখ ভেসে যায়। এবং গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলতে তুলতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

প্রায় সময় সে অজ্ঞান হয়ে থাকে। খুব কম সময় তার জ্ঞান থাকে। জ্বর আর বসন্তের গুটি তার সারা শরীরকে জ্বালিয়ে দিতে থাকলো। সুন্দর শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে থাকলো। এবং জ্বরের ঘোরে সে প্রলাপ বকতে থাকলো, 'বাঁচাও! গুল আমাকে বাঁচাও।...দেখো দেখো এই লাভা আমার চোখগুলোকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে।...জ্বলন্ত আগুন আমার হাড়গুলোকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।...কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ পোকাগুলো আমার শরীরের কোষে ঢুকে যাচ্ছে। চারদিকে কেবল ঝোপঝাড়, জঙ্গল...জঙ্গল। বালি... বালির সমুদ্র ...আমি ডুবলাম,...আমি মরলাম। বাঁচাও! বাঁচাও!'

সাতাশ দিন পর জ্বর ছাড়লো! ঝড় থামলো। এবং লাচি গভীর অন্ধকারের মধ্যে নিজের চোখ খুললো। কিন্তু এখন সে আজীবনের জন্যে অন্ধ হয়ে গেছে। আর খসখসে বিশ্রী হাড্ডি-চর্মসার শরীরের

উপর এতো বড় বড় অন্ধকার গর্তে ভরে আছে যে, দেখতে মনে হয় যেন কেউ তার সৌন্দর্যের নীচে দেয়াশলাই রেখে তা বারুদের আগুনে উড়িয়ে দিয়েছে।

তিন মাস অতিবাহিত হবার পর লাচিকে হাসপাতাল থেকে আবার জেলে ফেরত পাঠানো হলো। এবং একবার আবার তাকে জেল সুপারেন্টেণ্ডেণ্টের কামরায় হাজির করা হলো—সেই কামরায় যেখানে জেলে ঢোকানোর আগে তাকে প্রথম আনা হয়েছিলো।

জেলের অনেক লোক লাচিকে দেখার জন্যে বড় উন্মুখ হয়ে ছিলো —হাজী, মীর চন্দানী, কৌশল্যা, জিনাবাঈ, কালীচরণ এবং অন্যান্যরা লাচির রূপ-সৌন্দর্যের সাথে গুটিবসন্ত কেমন ব্যবহার করেছে তাই দেখার জন্যে বড় আগ্রহী ছিলো।

হাসপাতাল থেকে ওরা প্রতিনিয়ত যে রিপোর্ট পাচ্ছিলো তার প্রতি ওদের পূর্ণ আস্থা ছিলো না। কেন না লাচিকে ওরা নিজের চোখে দেখেছিলো। এবং আপন চোখের সামনে থেকে যে ছবি ক্রমে ক্রমে মনের ভেতরে গিয়ে বাসা বাঁধে, তা কোনদিনই মুছে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিতীয়বার সে পরিবর্তন আপন চোখে দেখে।

সবাই তাকে দেখার জন্যে পাগল। স্রেফ খুব চান্দ তাকে দেখতে চান না। যদিও দেখার ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

লাচিকে যখন হাসপাতাল থেকে তার কামরায় আনা হলো, তখন তিনি একা ছিলেন। তিনি চান না তার মনের প্রতিক্রিয়াটা অন্য কেউ জানুক। তাই খুব চান্দের ইঙ্গিতে লোকটা লাচিকে তার কামরায় একা রেখে বেরিয়ে গেলো।

লাচি ভেতরে প্রবেশ করতেই হঠাৎ খুব চান্দ দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললেন। যেন এ দৃশ্য দেখতে চান না তিনি। কিন্তু সারাক্ষণ তো আর চোখ বন্ধ করে থাকা যায় না, তাই চোখ তাকে খুলতেই হলো —লাচিকে দেখতে হলো।

এবং প্রথম দর্শনেই লাচির কুৎসিৎ চেহারা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন শেলের

মতো এসে তার হৃদয়ে বিঁধে গেলো।

কোথায় গেলো সেই মহামূল্যবান রূপ-যৌবন, যাকে নিয়ে তিনি প্যারিস যেতে চেয়েছিলেন! কোথায় গেলো সেই ফুলের মতো প্রস্ফুটিত চেহারা, জীবনের মতো সতেজ সৌন্দর্য, যার ছবি তিনি মাসের পর মাস ধরে অনেক কষ্ট আর পরিশ্রম করে তৈরী করেছিলেন।

একি সেই লাচি, যে কিনা তার তাবৎ আবেগ অনুভূতিতে একদিন গভীর আলোড়ন তুলেছিলো? যার কল্পনায় তার রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিলো? যার বিমুগ্ধ পদতলে মাথা রাখার জন্যে একদিন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তিনি?

একি কুৎসিত চেহারা, বিশ্রী শরীর, ভীতিপ্রদ মুখ, ছেঁড়াফাঁড়া ঠোঁট, মোচড়ানো চিবুক, ধ্বসে যাওয়া নাক এবং অন্ধগুহার ভেতর চকচকে দীপ্তিহীন দৃষ্টিহীন সাদা সাদা ফ্যাকাশে চোখ!

এই কি সেই লাচি? হে খোদা—!

'সুপরিটান।'

লাচি মৃদুস্বরে বললো, 'আমার সাথে কি কথা বলবে না?'

'না লাচি!'

খুব চান্দ চিন্তান্বিত স্বরে বললো, 'তা না, আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে।'

'আমি খুব কুৎসিত, তাই না?' লাচি খুব চান্দকে জিজ্ঞেস করলো।

এ প্রশ্ন খুব চান্দকে আরো চিন্তান্বিত করে তুললো। তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করতে করতে বললেন, 'না—না, লাচি—! তা না—তুমি এই চেয়ারে বসো।'

খুব চান্দ লাচিকে ধরে চেয়ারে বসাতে চাইলেন। কিন্তু লাচি বসলো না। বললো, 'আমি তো তোমার কয়েদী, সুপরিটান! তোমার সামনে কি করে চেয়ারে বসতে পারি?'

'হাসপাতালে তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো?'

তাড়াতাড়ি বলতে থাকলেন খুব চান্দ, 'আমি নিজে তোমাকে

দেখার জন্যে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এদিকে জেলে হঠাৎ এতো কাজ বেড়ে গেলো যে, একেবারে সময়ই পেলাম না। তবে সব সময় মনে মনে আমি তোমাকে স্মরণ করেছি। এখানে জেলের সবাই তোমার আচার-ব্যবহারের, উন্নত চরিত্রের, তোমার বিভিন্ন গুণাবলীর... ...'

'সুপরিটান !'

লাচি খুব চান্দের কথা শেষ হবার আগেই কেটে দিলো, 'তা এখন এসব কথার অর্থই বা কি !'

'হ্যাঁ, লাচি !'

'আমাকে প্যারিস নিয়ে যাবে তো ?'

'প্যারিস ? উহঃ ! প্যারিস ? হাঃ হাঃ হাঃ !'

খুব চান্দ লাজুক হাসি হাসলেন।

'হ্যাঁ, স্রেফ আমার ছবিই বানাবে তো ? কেননা কখনো কখনো একেকটা ব্যক্তিত্ব একেকটা সমুদ্রের মতো হয়ে থাকে। এবং আমিও তো একটা সমুদ্র। কি হবে আমার ভেতরে না হয় একটু ময়লা আবর্জনা এসে মিশে গেছে ! সমুদ্রে তো হাজার হাজার টন ময়লা আবর্জনা এসে মিশে যায়। মানুষের সৃষ্ট কতো মালিন্য সমুদ্রের বিশালতায় একাকার হয়ে যায়, তাই না ?' লাচির কণ্ঠস্বরে একরাশ তিক্ততা প্রকাশ পেলো।

'এই—এই— লাচি ! শোন লাচি, তোমার জন্যে একটা সু-খবর আছে।'

হঠাৎ লাচির মনটা এক অজানা আশায় যেন ভরে গেলো।

গুল ফিরে এসেছে ? নিশ্চয় গুল ফিরে এসেছে !

লাচির পা জোড়া কাঁপতে লাগলো, সে আর দাঁড়াতে পারলো না। চেয়ারের হাতল ধরে হঠাৎ বসে পড়লো—এবং বড় দুর্বল স্বরে বললো, 'গুল ফিরে এসেছে ? তার চিঠি এসেছে ?'

'না।' খুব চান্দ টেবিলের ড্রয়ার থেকে একখানা ফাইল বের করতে করতে বললেন।

খুব চান্দের মুখে 'না' শুনেই যেন লাচির বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্বাস-

প্রশ্বাস আবার চলতে শুরু করলো। শিরায় শিরায় যেন আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়ে গেলো। যে ভয়-ভীতি এবং আতঙ্ক তার গলা টিপে ধরেছিলো তা যেন এক মুহূর্তে কোথায় হারিয়ে গেলো।

'সরকার আমার বিশেষ অনুরোধে, তোমার উত্তম চাল-চলনের জন্যে, রেকর্ডপত্র দেখে তোমার বাকী সাজা ক্ষমা করে দিয়েছে। আজ থেকে তুমি মুক্ত, যেখানে ইচ্ছে তুমি যেতে পারো।'

'যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো' কথা ক'টা যেন লাচির বুকে তীরের মতো বিঁধে গেলো।

এক সময় সে ভেবেছিলো, পরিকল্পনাও করেছিলো, জেল থেকে মুক্ত হয়েই সে তার গুলের দেশে যাবে। তাকে খুঁজে বের করবে। পায়ে হেঁটে, জায়গায় জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে একদিন নিজের আকাঙ্খিত গন্তব্য সে পেয়েই যাবে।

কিন্তু তখন তো তার চোখ ছিলো। সে চোখে কোটি কোটি মানুষের চেহারার ভিড়েও তার প্রিয়তমের চেহারা ঠিকই খুঁজে বের করে নিতে পারতো। এখন সে এই বিশাল দিকচিহ্নহীন অন্ধকার জগতে হারিয়ে গিয়ে কি করে তার গুলকে খুঁজে বের করবে? ভবিতব্য তার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যদি চোখ দু'টি রেখে যেতো! চোখ তো আপন প্রিয়তমকে দেখার জন্যেই থাকে।

'এখন তুমি কোথায় যাবে লাচি?'

খুব চান্দ প্রশ্ন করে লাচির চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে দিলেন। এবং লাচিও নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলো—এখন তুই কোথায় যাবি লাচি?

এই জেলের চার দেয়াল যেটা কয়েক মাস অসহায় অন্ধের জন্যে আশ্রয়স্থল হিসেবে ছিলো, সেটাও ওরা তোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

এখন তুই কোথায় যাবি?

যার জন্যে তুই গোত্র ছেড়েছিস এবং যার জন্যে গোত্র তোকে ছেড়েছে, সেও তো এখানে নেই।

তাহলে খুঁজে বের কর……

এই পৃথিবী অনেক বড়……কোথাও না কোথাও আশ্রয়স্থল তুইও পেয়ে যাবি!

চারদিকে খুঁজে দেখ……

এখানে কি তোর কেউ নেই?

লাচি আপন মনে চারদিকে দৃষ্টি ফেরালো, কিন্তু তার দৃষ্টি তো অন্ধ, কিছুই দেখা যায় না। চারদিক থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলো। এবং মৃদুস্বরে বললো, 'আমাকে জেলখানার বাইরে ছেড়ে দাও, যেখানে যেতে হবে আমি নিজেই চলে যাবো।'

খুব চান্দ তাড়াতাড়ি কলিং বেল বাজালেন। একজন পিওন ভেতরে এলো। খুব চান্দ বললেন, 'লাচিকে কালিচরণ বাবুর অফিসে নিয়ে যাও। সে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করে তাকে মুক্তি দেবে।'

পিওন লাচিকে ধীরে ধীরে খুব চান্দের অফিস থেকে বের করে নিয়ে গেলো।

খুব চান্দ রুমাল বের করে মাথার ঘাম মুছতে লাগলেন। মনে মনে তিনি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। তেমন কড়া কথাবার্তা হয়নি, ব্যাপারটা সহজে মিটে গেছে।

কালীচরণের অফিসে জেলের লোকজনের প্রচণ্ড ভীড়। জেলের তিন চারজন মেয়ে ছাড়াও জিনাবাই, মীর চন্দানী এবং হাজী আবদুস সালামও উপস্থিত। সবাই অবাক বিস্ময়, সহানুভূতি এবং পরিহাস মিশ্রিত আবেগ নিয়ে লাচিকে দেখতে থাকলো। কিন্তু সবাই নীরব নিস্তব্ধ, যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। লাচির অসামান্য রূপ-সৌন্দর্য যেমন সবার আবেগকে উত্তেজিত করে তুলছিলো, তেমনি তার কুশ্রীতাও সবার আবেগকে বরফের মতো শীতল করে দিয়েছে। তখন যদি ওরা ভেবে থাকে, এমন সৌন্দর্য অসম্ভব, তাহলে এখন ওরা ভাবছে, এমন কুশ্রীতাও বা কি করে সম্ভব!

কালীচরণ যাবতীয় কাগজপত্রের উপর লাচির সই করিয়ে নিয়েছেন। এখন তার মুক্তির সময়।

লাচি বললো, 'হাজীজি এখানে আছে?'

'হ্যাঁ, আছেন।' কালীচরণ বললেন।

'এবং মীর চন্দানী?'

'তিনিও আছেন। কেন?' কালীচরণ জিজ্ঞেস করলেন।

লাচি বললো, 'একবার জিনাবাঈর মাধ্যমে ওরা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো, আমার ইজ্জত নেয়ার বিনিময়ে ওরা আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে। আমি কুশ্রী হয়ে গেছি ঠিকই, কিন্তু আমার ইজ্জত এখনো অক্ষুণ্ণ আছে।'

অফিসে একরাশ নীরবতা যেন জেঁকে বসেছে।

লাচীর দৃষ্টিহীন চোখজোড়া মিটমিট করে উঠলো। হাজী এবং মীর চন্দানীর দিকে ঘুরে বললো লাচি, 'আজ ডাক উঠুক। এসো আজ লাচির ইজ্জতের নীলাম হোক। বলো হাজী, মীর চন্দানী···পঞ্চাশ হাজার দেবে বলেছিলে, আজ পাঁচ টাকা দিয়েই শুরু করো।—পাঁচ টাকা এক, পাঁচ টাকা দুই—এ্যাঁ? কি ব্যাপার, আজ কেউ ডাকবে না?'

সবাই নীরব নিশ্চুপ বসে থাকলো।

এক সময় লাচি জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

বিষাক্ত হাসির একটা ছোট্ট কণিকা যেন তার পাতলা ছিপছিপে হাড্ডির ফ্রেমের মতো শরীরকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো।

সবাই তখনো নীরব নিস্তব্ধ।

এক সময় কালীচরণ ইশারা করলে দু'জন ওয়ার্ডার লাচির দু'বাহু ধরে তাকে জেলের বাইরে ছেড়ে দিয়ে এলো।

বাইরের পৃথিবীও তেমনি অন্ধকার, যেরকম অন্ধকার জেলের পৃথিবী। আসলে লাচি এখনো নিজের অন্ধতার উপর অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। জেল থেকে বেরুবার পর তার চোখ-জোড়া স্বাভাবিক ভাবেই আকাশের দিকে চলে গিয়েছিলো।

তার ধারণা ছিলো, সে উন্মুক্ত নীল আকাশ দেখবে। উজ্জ্বল রোদ দেখবে। সাদা সাদা মেঘগুলোকে পূতঃপবিত্র আকাঙ্খার মতো ছুটে বেড়াতে দেখবে। মানুষজন দেখবে। রঙ-বেরঙের মোটর-গাড়ী, রাস্তার লম্বা লম্বা লাইটপোষ্ট, সুন্দর সুন্দর, ফুটফুটে বাচ্চাদের রঙীন বেলুন উড়াতে উড়াতে, একজন আরেকজনের পেছনে হৈ-হল্লা করতে করতে ছুটে বেড়াতে দেখবে।

জেল থেকে বেরুবার পর মুহূর্তের জন্যে তার মন-মস্তিষ্কে এসব চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়েছিলো। কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন দেখলো আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী কালো এবং দিগন্ত বিস্তৃত কালো পুরু চাদরে মোড়া তখনি তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। লাচি ওখানেই জেলের বাইরে ফুটপাথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। এবং মাটিতে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকলো।

ধরণীর ধূলোবালি তার চোখে, তার ঠোঁটে লুটোপুটি খেতে থাকলো। তার দীপ্তিহীন চোখের অসহায়তা এবং তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা আনন্দাশ্রু হয়ে গড়াতে গড়াতে ধরণীর বুকে বিলীন হয়ে যেতে থাকলো।

কিন্তু সমস্যা হলো অশ্রু স্রেফ অশ্রুই, পানি নয়। পানি থেকে ধরণীর বুকে লুকিয়ে থাকা বীজ ফেটে চারা গজায়। কিন্তু অশ্রু থেকে মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা দুঃখ গজায় না। তা না হলে এই মাটির পৃথিবীর এখানে সেখানে অহরহ দুঃখের চারা গজাতো আর যত্রতত্র মানুষের অত্যাচারের সাক্ষী বহন করতো।

ষ্টেশন ইয়ার্ডে বড় হাঙ্গামা।

রেসকলাল তার শিথিল পাগড়ী সামলাতে সামলাতে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করছেন।

ষ্টেশন থেকে সামান্য আগে রেললাইন খারাপ হয়ে গেছে। এজন্য ফ্রন্টিয়ার মেল দিল্লী থেকে আসবার পথে এখানে কয়েক ঘণ্টার জন্যে থামবে। এবং ফ্রন্টিয়ার মেলের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন আজ পর্যন্ত এ ষ্টেশনে কখনো থামেনি।

রেসকলাল এজন্যে খুব খুশী। অবশ্য ভেতরে কিছুটা ঘাবড়েও গেছেন। ষ্টেশনের কুলি, পয়েন্টস্‌ম্যান, সিগন্যালম্যান, ইয়ার্ড মিস্ত্রী সবার দুর্ভোগ বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন ফ্রন্টিয়ার মেল নয় বরং গভর্নরের গাড়ী এ ষ্টেশনে কিছুক্ষণ থামার জন্যে আসছে।

ষ্টেশনের বাইরে ফলঅলা মাধু আর ট্যাক্সী ড্রাইভারদের সর্দার হামিদেরও খুশীর অন্ত নেই। আজ গাহাক অনেক বেড়ে যাবে। তাই ফলের দাম আর ট্যাক্সীর ভাড়াও বাড়বে অনেক।

প্রাইভেট ট্যাক্সীর ব্যবসা বেশ জমে উঠবে আজ। কেননা অনেক যাত্রী ফ্রন্টিয়ার মেলের জন্যে এখানে অনর্থক বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করবে না। এখান থেকেই ওরা ট্যাক্সী ভাড়া করে, বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্যে ফলমূল নিয়ে শহরে রওনা দেবে।

মাধুলাল তাড়াতাড়ি তার ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে ফলগুলোকে ঝেড়েমুছে জুতের মতো চকচকে করে তুলছে। ট্যাক্সীগুলোও ষ্টেশনের বাইরে একপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

রাস্তার অপর পাশে ছোট-বড় পাথর ভাঙ্গার মেশিনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর্জন করছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে। রাস্তা মেরামতের কাজ পুরোদমে চলছে।

পানঅলার চোখও খুশীতে চক্ চক্ করছে। গত দু'দিনের মন্দাভাব আজ পুষিয়ে নেবে সে।

ফ্রন্টিয়ার মেল চার নম্বর প্ল্যাটফরমে এসে থামলো। কিন্তু তেমন হৈ-হুল্লোড় হলো না। যাত্রীরাও খুব একটা নামলো না।

কারণ গাড়ী থামার সাথে সাথেই খবর এলো সামনের রাস্তা ঠিক হয়ে গেছে। তাই গাড়ী কয়েক ঘণ্টার পরিবর্তে মাত্র কয়েক মিনিট থামবে।

এ কারণে যেসব যাত্রী এখান থেকে নেমে ট্যাক্সী ভাড়া করে শহরে চলে যাবার পরিকল্পনা নিয়েছিলো, এখন তারা ষ্টেশনের লাউড-স্পিকারে খবরটা শুনে সে পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে।

আর কুলী, পানঅলা, ফলঅলা, ট্যাক্সীঅলা এবং প্রাইভেট গাড়ী-

অন্যরা সবাই হতাশ হয়ে যার যার মালসামানা গুটাতে শুরু করে দিলো।

'দুর, আজ ভাগ্যটাই খারাপ।' ট্যাক্সী ড্রাইভার হামিদে রেল-লাইনের পাতের উপর জোরে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বলে উঠলো।

গাড়ী থেকে জনা কয়েক যাত্রী অবশ্য নেমেছে। তার মধ্যে গুলও আছে। হামিদে তাকে দেখেই চিনে ফেললো। এবং তার কাছে ছুটে গেলো। হাত বাড়িয়ে গুলের সাথে করমর্দন করলো হামিদে।

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি পাকিস্তান চলে গেছো। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি কিনা।'

'বাবা পাকিস্তান চলে গেছে। কিন্তু আমি দিল্লীতেই ছিলাম। অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছিলাম এ দেশের নাগরিকত্ব নেবার জন্যে।'

'তা শেষ পর্যন্ত হলো? কিছুটা অগ্রসর হয়েছো?'

'হ্যাঁ।, গুল খুশী হয়ে বললো, 'আমি এখানকার নাগরিকত্ব পেয়ে গেছি। লাচির কি খবর?'

'আমি তো জানি না।'

গুল বললো, 'দিল্লী থেকে জেলের ঠিকানায় তিন-চারটা চিঠি দিয়ে ছিলাম, কিন্তু একটিরও জবাব পাইনি। এখন কাল জেলে যাবো, তার সাথে দেখা করে আসবো।'

'তার সাজাও তো প্রায় শেষ হবার পথে, তাই না?' হামিদে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ।'

গুল খুশী হয়ে বললো, 'আমার হিসেবে আর মাত্র চার মাস বাকী আছে।' ওরা দু'জন কথা বলতে বলতে ইরানী রেস্তোরাঁর কাছে এসে পৌঁছলো। ইরানী রেস্তোরাঁর একটা দরোজা ষ্টেশনের ভেতরে, আরেকটা ষ্টেশনের বাইরে—যেখান থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যায়।

'এসো চা খাই।' গুল হামিদেকে বললো।

'না না, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। দেখি যদি কোন যাত্রী-টাত্রী পাই।' হামিদে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো এবং বাইরে চলে গেলো।

গুল রেস্তোরাঁয় ঢুকে চায়ের অর্ডার দিলো এবং নাগরিকত্বের কাগজখানা বের করে গভীরভাবে তা দেখতে থাকলো।

ষ্টেশনের বাইরে রাস্তার উপর একটা বেশ বড়সড় হাঙ্গামা হয়ে গেছে। ষ্টেশনের লোকজন সব ফ্রন্টিয়ার মেল থেকে হতাশ হয়ে এখন সেই হাঙ্গামায় বড় উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা খুবই মামুলী। একজন অন্ধ ভিখারিণী ভিক্ষা করতে করতে হঠাৎ একজন যাত্রীর গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। এতে যাত্রী বিরক্ত হয়ে তাকে গালি দিয়েছে, কিন্তু অন্ধ ভিখারিণীটি হাসিমুখে সে গালি হজম না করে যাত্রীটির হাত ধরে তার মুখের উপর একটা ঘুষি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

এ জাতীয় ঘটনা কেউ আজ পর্যন্ত দেখেওনি, শুনেওনি। এ জন্যে সবাই ভিখারিণীর উপর রেগে গেছে। আর ভিখারিণীটিও বড় অদ্ভুত। তার সমস্ত মুখমণ্ডল বসন্তের দাগে ভরা। বড় ভীতিপ্রদ চেহারা তার। শতচ্ছিন্ন কাপড়-চোপড়ে একরাশ ময়লা আবর্জনা—দেখতে ভয়ানক কোন ডাইনী বা পেত্নীর মতো মনে হয়।

'বেশ্যা মাগী, পয়সা না দিলেই ঘুষি?'

'কিন্তু তুই আমাকে গালি দিলি কেন?' লাচি জোরে চেঁচিয়ে উঠলো।

তার কি যে হলো কে জানে। কয়েক মাস থেকে সে এই এলাকার ধারে-কাছেও আসেনি। সব সময় শহরের অন্য এলাকায় ভিক্ষে করে করে দিন কাটিয়ে দিতো, তবুও সে এই ষ্টেশন এলাকায় আসার নাম করেনি। অথচ এখানেই কোন এককালে তার গোত্রের লোকরা থাকতো। এখানেই তার প্রেমিকের ব্রীজ এবং এই ষ্টেশন ইয়ার্ডের এখানে ওখানে তার প্রেম-কাহিনীর কত চিহ্ন বিদ্যমান।

কিন্তু মনকে হাজারবার প্রবোধ দেয়া সত্ত্বেও এ এলাকায় না এসে পাড়লো না সে। বোধ হয় আপন দেশের মাটি তাকে ডাকছে।

এই ষ্টেশন ইয়ার্ডই তো তার আপন দেশ। বোধ হয় অতৃপ্ত বাসনা-গুলো কিম্বা অতীতের স্বপ্নগুলো তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছে। যাই হোক না কেন, আজ সে এখানে চলেই এসেছে।

জিজ্ঞেস করে করে, কাঁকর বিছানো রাস্তা খুঁজে খুঁজে সে আজ নিজের অতীতের কাছে ফিরে এসেছে।

যদি এই মাটি তাকে চিনতে পারে!

যদি এখানে এসে ভালো কিছু করার ইচ্ছে জাগে!

যদি?...যদি?...

এজন্যেই তো যাত্রীটির গালি শুনে তার বড্ড রাগ ধরে গেলো। সে তো এই ষ্টেশন ইয়ার্ডের রাণী ছিলো।

এই এলাকার রাণী!

এখানে সে যে জায়গা দিয়েই হেঁটে যেতো, সবার চোখ আপনা থেকে নত হয়ে আসতো।

যাত্রীটিকে সে বলে দেবে, সেই পুরনো লাচি সে। গালি শুনেই সে যাত্রীটির হাত ধরে মুখে দু'টো থাপ্পড় কষে দিয়েছিলো। রাগে দুঃখে তখন তার সারা শরীর কাঁপছিলো।

পরে কে যেন তার হাত থেকে লাঠি ছিনিয়ে নিলো। এবং তার গালে জোরে একটা চড় মেরে বললো, 'হারামজাদী! একে তো ভিক্ষে করিস, তার উপর ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস!'

লাচি কণ্ঠস্বরটা চিনে ফেললো। এ ট্যাক্সী ড্রাইভার হামিদের কণ্ঠস্বর। মুহূর্তের জন্যে সে হতবাক হয়ে গেলো। পরে রাগে দুঃখে তার চোখ ফেটে অশ্রুর বন্যা বয়ে গেলো। যেন সে ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, 'অন্ধ বলে আমাকে অপমান করছিস? কাছে আয় না হাড্ডি-চামড়া এক করে দেবো, জানিস আমি কে?'

'আর কে, শয়তানের খালা! ভূত-পেত্নী, গোরস্থানের ডাইনী আর কি। কত দেখলাম এই আড্ডায় তোর মতো পেত্নী!' হামিদে রেগে গিয়ে বললো। পরে অন্ধের লাঠি দিয়েই বসিয়ে দিলো তার পিঠে আরেক ঘা।

লাচি ছটফট করে উঠলো, বড় অস্থিরভাবে চারদিকে ঘুরে ঘুরে

দু'হাত প্রসারিত করে হামিদেকে খুঁজতে লাগলো সে।

লাচির এ অবস্থা দেখে ইস্কুল ফেরতা ছেলেপেলেরা জোরে জোরে হাসতে লাগলো। কেউ কেউ রাস্তা থেকে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে লাচির দিকে তাক করে মারতে লাগলো।

'মার! মার!'

কয়েকজন ছেলেপেলে খুশীতে চীৎকার দিয়ে উঠলো।

যে লোকটিকে লাচি ঘুষি মেরেছিলো, সেও একখানা পাথর তুলে লাচির গায়ে মারলো।

লাচির মাথা কেটে রক্ত বেরুলো। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে যেতে লাগলো। লোকজন অন্যদিক থেকে এসে তাকে ধাক্কা মারলো। ফলঅলা মাধু রাগের চোটে পাথর ছুঁড়ে মারলো এবং বললো, 'মার মার!'

পাথর লাচির কাঁধে এসে লাগলো।

লাচি মাধুর কণ্ঠস্বরও চিনে ফেললো। মনে মনে বললো, 'এ মাধু।'

'মার মার শালীকে।' পানঅলা পাথর তুলে নিলো।

'এ বদমাশ পানঅলা।' লাচি মনে মনে বললো।

লাচি এবার মাটিতে ঢলে পড়লো। এবং চারদিক থেকে তার গায়ে পাথর বর্ষিত হতে থাকলো। দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললো লাচি এবং মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। আর পাথরের বৃষ্টি তার সারা শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যেতে লাগলো।

এক সময় ভীড়টা কমে আসছে মনে হলো। মানুষজন যেদিকে পারছে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের বুটের আওয়াজ শোনা গেলো, আস্তে আস্তে কাছে আসছে। পরে কে যেন দু'বাহু ধরে তাকে তুলে তাড়াতাড়ি ইরানী রেস্তোরাঁর দিকে নিয়ে গেলো। দু'টো টেবিল একত্র করে তাকে লম্বা করে শুইয়ে দিলো। তারপর কে যেন মোটা গলায় বললো, 'পানি নিয়ে এসো, পানি নিয়ে এসো।'

হঠাৎ চমকে উঠলো লাচি। এ কণ্ঠস্বর গুলের—যা তার শিরায় শিরায় যেন ঢুকে যাচ্ছে।

এটা গুলের হাত যেটা তার ক্ষতস্থান ধুয়ে-মুছে দিচ্ছে।

এটা স্বর্গীয় জলবিন্দু যেটা তার অন্ধ চোখে দৃষ্টি প্রদান করছে।

এ তো আমার গুল!

এ তো আমার গুল!

'কি হয়েছে?' একজন পুলিশ গুলকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি ঠিক জানি না। এখানে বসে চা পান করছিলাম আমি। হট্টগোল শুনে বাইরে এসে দেখি লোকজন ওর উপর পাথর ছুঁড়ে মারছে। আমি তাড়াতাড়ি ওকে উঠিয়ে এখানে নিয়ে এলাম।'

'ভালো করেছেন।'

'জ্ঞান ফিরে এলে তুমি বেচারীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করে নিয়ে যেও সান্ত্রীজি!'

সান্ত্রী জোরে হেসে উঠলো।

'এসব ভিখারিণীদের জবানবন্দী রিপোর্ট করতে হলে তো শহরের পুলিশকে আর কোন কাজই করতে হবে না।'

সান্ত্রী হাসতে হাসতে চলে গেলো।

ইরানীর কাছে ফার্স্ট এইডের সাজসরঞ্জাম ছিলো। গুল তাড়াতাড়ি কোন রকমে ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিলো বটে, তবে ডাক্তারের কাছে শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো। ডাক্তারের দোকান ষ্টেশনের বাইরে পানঅলার দোকানের সামনে।

গুল ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি হাঁটতে পারবে?'

লাচি আস্তে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো।

আসলেও তাই। তার সারা শরীরে এটুকুনও শক্তি নেই। হাঁটার জন্যে একটুও বল পাচ্ছিলো না সে। হয়তো চোট খেয়ে আধমরা হয়েও সে ওখান থেকে চলে যেতো। কিন্তু গুলের আবির্ভাব যেন তার মনের ও শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে।

গুল ওকে দু'বাহুতে তুলে নিলো। তারপর ইরানীকে বললো, 'আমি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

লাচি গুলের কাঁধে নিজের মাথা অনুভব করতেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদতে লাগলো। এমন কান্না সে জীবনেও বুঝি কাঁদেনি। জীবনের তাবৎ বঞ্চনা, হতাশা, আক্ষেপ, স্মৃতি যেন হৃদয়ের গভীর থেকে ঝর্ণার মতো ছুটে বেরুতে থাকলো। আহা, এই দু'বাছর মধ্যেই যদি তার মরণ হতো, তাহলে কতো ভালো হতো। এই অন্ধ জীবনটা যদি তার প্রেমিকের দু'বাছর মধ্যে কেটে যেতো তাহলে মৃত্যুটা কত সুন্দর হতো।

হে খোদা! আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না, ব্যস স্রেফ এই মুহূর্তে আমার জীবনটা নিয়ে নাও। আমাকে এই কাঁধের উপর আজীবনের জন্যে শুয়ে থাকতে দাও।

গুল ডাক্তারের দোকানে গিয়ে ওকে ধরে বেড়ে বসিয়ে দিলো। ডাক্তার তার ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে গুলকে বললো, 'ক্ষতটা মামুলী, তেমন গভীর নয়। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিদিন আসতে হবে পট্টি বাঁধার জন্যে। ওর নাম?'

গুল লাচির দিকে ঘুরে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম?'

লাচি চুপ করে রইলো—চুপ করে রইলো। ওর মনের ভেতরে ঝড় উঠতে লাগলো—ক্রমশঃ বাড়তে থাকলো—মহাপ্রলয়ের গগনবিদারী আর্তনাদ যেন তার কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

এটা কি গুলের কণ্ঠস্বর, না সুরা ইস্রাফিল?

তোমার নাম! তোমার নাম! তোমার নাম!

যেন আকাশ আর মাটির গহ্বর থেকে আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়লো এবং বজ্রের মতো হুঙ্কার ছেড়ে লাচির চারপাশে ঘুরতে লাগলো।

'ডাক্তার সাহেব তোমার নাম জিজ্ঞেস করছেন।' গুল বড় মোলায়েম স্বরে বললো।

'আমার তো কোন নাম নেই!' শেষে বড় কষ্টে বললো লাচি।

'ঠিকই বলেছে' ডাক্তার তাড়াতাড়ি প্যাডে কিছু লিখতে লিখতে বললো, 'এসব রাস্তার অন্ধ ভিখারিণীদের কিই বা নাম থাকতে পারে?'

'তা কি করে হয় ডাক্তার সাহেব!'

গুল হেসে বললো, 'এসব অন্ধ ভিখারিণীদেরও একটা নাম থাকে, আস্তানা থাকে—যেখানে ওরা প্রতিরাতে ঠিকই গিয়ে পৌঁছে যায়।'

'তুমি ঠিকই বলেছো।' লাচি মনে মনে বললো, কোনদিন আমারও একট নাম ছিলো, একটা ঘর ছিলো—যেখানে আমি প্রতিদিন কল্পনায় পৌঁছে যেতাম। রাতে, দিনে, সকালে, বিকেলে। কিন্তু আজ আমার কল্পনায় যে রাত এসেছে—তার কোন কুল কিনারা নেই!

এখন আমি কোথায় যাবো? কাকে ডাকবো? কার কাছে আমার নাম বলবো? এবং কার ঘরের দরোজার কড়া নাড়বো?

ডাক্তার—ডাক্তার! কেন এই অস্ত্র দিয়ে আমার জখমটা পরিষ্কার করছো? ওটা ওভাবে লুকিয়ে থাকতে দাও না, যাতে জীবনের তাবৎ জ্বালা এক নিমিষে শেষ হয়ে যায়!

ডাক্তার প্যাডের পাতা ছিঁড়ে গুলের হাতে এগিয়ে দিলো।

'পাঁচ টাকা। আর যদি সাতদিন পট্টি বাঁধাও তাহলে সাত টাকা আরো দিতে হবে।'

গুল পকেট থেকে বারো টাকা বের করে ডাক্তারের হাতে দিয়ে বললো, 'সাত টাকা ও আর কোত্থেকে দেবে? এ টাকাও আমি দিয়ে দিচ্ছি।' পরে লাচির দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রতিদিন পট্টি পাল্টাবার জন্যে এসো।'

'ঠিক আছে।' লাচি বড় দুর্বলস্বরে বললো।

গুল লাচিকে ধরে দোকানের বাইরে নিয়ে এলো। তারপর বললো, 'যদি বলো, আমি তোমাকে আস্তানায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি?'

'না, আমি নিজে যেতে পারবো।'

গুল চুপ করে রইলো। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললো, 'তোমার আস্তানা কোথায়?'

'আমার আস্তানা?' লাচি বললো, 'যেখানে রাত, সেখানেই কাত। বাবু, তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো, এবার তুমি যাও, নিজের ঘরে যাও…'

হঠাৎ লাচির গলা ভারী হয়ে এলো।

গুল ওকে দেখতে থাকলো। পরে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে চলে যেতে লাগলো।

ও চলে যাচ্ছে। ও চলে যাচ্ছে। ও চলে যাচ্ছে। ও চলে যাচ্ছে।

ওকে তুই আর কোনদিন খুঁজে পাবি না। ওকে তুই আর কোনদিন দেখতে পাবি না। কোনদিন স্পর্শ করতে পারবি না।

ওর জন্যে কাঁদতে কাঁদতে জীবন শেষ করবি।

অথচ ও কিছুই জানবে না।

হঠাৎ লাচি দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। এবং টলতে টলতে গুলের পায়ের আওয়াজ বরাবর ছুটতে থাকলো। এবং নিজের দু'বাহু দিয়ে গুলকে জড়িয়ে ধরলো লাচি। তারপর তার বুকে মুখ লুকোতে লুকোতে বললো, 'গুল···গুল···গুল···আমাকে চিনতে পারছো না? আমি লাচি!'

মিলনের রাত এসেছে। কিন্তু সে রাত কারো জন্যে নিয়ে এসেছে একরাশ ভয়ভীতি আর আতঙ্ক; আবার কারো জন্যে নিয়ে এসেছে একরাশ হাসিখুশী, আনন্দ-উল্লাস।

একই রাত, অথচ দুজনের জন্যে নিয়ে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি। লাচি প্রশান্তি মাখা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গুলের বুকের সাথে লেপ্টে থেকে ঘুমিয়ে পড়লো। আর গুল ভাবতে থাকলো—এক রাতের ভেতর দু'রাত কি করে সম্ভব?

এক রাত কালো এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাত গভীর, কত অথৈ, কত কুৎসিত, বিশ্রী, ময়লা আবর্জনায় ভরপুর।

আবার অন্য রাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আবেগে পূর্ণ। নিষ্পাপ, পূত পবিত্র রাত। যখন তারা জ্বলে উঠে এবং ধরণীর বুকে জ্যোৎস্নার বন্যা বয়ে যায়···এবং কেউ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে অন্যের উপর ছেড়ে দেয়।

হ্যাঁ, দু'রাতের মধ্যে অনেক ব্যবধান, যেরকম পাপ আর পুণ্যের মধ্যে।

লাচি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। ঘুমের মধ্যে তার বিশ্রী চেহারা দেখতে মনে হচ্ছে যেন কোন ভয়ানক গোরস্থান। গুল আস্তে করে বিছানা ছেড়ে উঠলো এবং বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

রাত নীরব নিস্তব্ধ এবং নিকষ অন্ধকার। কোথাও চাঁদ নেই,

তারা নেই। কালো মেঘ সারা আকাশকে অন্ধকার চাদরে ঢেকে দিয়েছে। গুল আকাশের দিকে তাকালো। কিন্তু আকাশের কাছ থেকে কোন রকমের সাহায্য সহানুভূতি আশা করা যায় না।

গুল হতাশ হয়ে নিজের মনের ভেতরে খুঁজে ফিরলো। কিন্তু সেখানেও সে কিছু পেলো না। মনটা আবেগহীন, প্রেমের ছিটে-ফোঁটাও নেই ওখানে। মনকে হাজার বার প্রবোধ দিলো সে। কিন্তু যখনি লাচির দিকে তাকায় ঘৃণা ভরা বিবমিষা জাগে তার।

এই লাচি সেই লাচি নয়, যাকে সে ভালোবাসতো। যার জন্যে সে পৃথিবীর সব রকমের গঞ্জনা মাথা পেতে নিয়েছিলো। যার জন্যে সে দেশ, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব দেয়াল টপকে চলে এসেছে; সে লাচি এখন তারই বুকে, অথচ তাকে ভালোবাসতে পারছে না। তাকে দু'বাহুতে জড়িয়ে ধরতে পারছে না। তার ঠোঁট জোড়ায় চুমু খেতে পারছে না। তার সেই আবেগ কোথায় হারিয়ে গেছে!

চারদিকে কেবল বরফ আর বরফ। যেদিকে তাকায় কেবল বরফ। যা কিছু স্পর্শ করে কেবল বরফ।

অথচ এই লাচি সেই লাচি।

গুল রাগে দুঃখে মাথার চুল সব ছিঁড়ে ফেলতে থাকলো। কিন্তু তবুও তার আবেগ অনুভূতি এতটুকুও জাগলো না।

সাতদিন পর ডাক্তার লাচির পট্টি খুললো। দশদিন পর লাচিও চলতে ফিরতে লাগলো। তখন গুল লাচিকে বললো, 'পুনায় আমি একটা চাকরী পেয়েছি। আমাকে ওখানে যেতে হবে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।' লাচি খুশী হয়ে বললো।

'তা যাবে, কিন্তু আগে আমাকে গিয়ে জয়েন করে আসতে তো হবে। তোমার জন্যে একটা ঘর খুঁজে নেবো। তা ছোট্টখাট্ট একটা সংসার তো করতে হবে।'

'আহা, আমার ঘর!' লাচি খুশীতে দু'হাত বুকের উপর রেখে বললো। পরে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে বললো, 'কতদিন লাগবে?'

'এক মাস.....'

'ততদিন আমি এখানে একা থাকবো?' লাচি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'না, আমি তোমাকে ছাড়া এতোদিন কি করে থাকবো?'

'মাত্র তো এক মাস। এক মাস পর আমি বোম্বে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। সম্ভব হলে তার আগেই নিয়ে যাবো। ইচ্ছে করলে তো এখনো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু নিয়ে গিয়ে ওখানে রাখবো কোথায়? এখানে তো বাবা ঘরটা আমার জন্যে রেখে গেছে। এখানে তোমার কোন অসুবিধে হবে না, সব রকমের আরাম হবে। আমি পাড়া-পড়শীদের বলে যাবো, তোমার কোন কষ্ট হবে না। প্রতি সপ্তাহে চিঠিও লিখবো।'

লাচি রাজী হয়ে গেলো। গুল লাচির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। যাবার সময় লাচিকে পঞ্চাশটা টাকাও দিয়ে গেলো খরচাপাতির জন্যে। লাচি খুব খুশী হলো।

এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেলো, কিন্তু গুলের চিঠি এলো না। দ্বিতীয় সপ্তাহও অতিবাহিত হয়ে গেলো, কিন্তু গুলের চিঠি এলো না। তৃতীয় সপ্তাহও অতিবাহিত হয়ে গেলো, কিন্তু গুলের কোন চিঠি এলো না।

ডাকপিওন দৈনিক আসে, লাচির ঘরের সামনে দিয়ে চলে যায়।

লাচি প্রতিদিন ডাকপিওনকে জিজ্ঞেস করে। আর ডাকপিওন প্রতিবারই মাথা নেড়ে না করে। তবুও লাচি প্রতিদিন ডাকপিওনকে জিজ্ঞেস করে। এভাবে এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো। দু'মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো। না এলো গুল, না এলো তার চিঠি।

লাচি গুলের দেয়া পঞ্চাশ টাকা রয়ে-সয়ে খরচ করলো। তা মোটে তো পঞ্চাশ টাকা! দু'মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেলো। আরও ক'দিন ধার-কর্জ করে চালালো। পরে কেউ আর ধার-কর্জও দিলো না।

এখন তিন দিন থেকে লাচি উপোষ। লোকজন তা দেখে হাসতে লাগলো। কেউ কেউ বলতেও লাগলো, 'অন্ধ, বেকুব! গুলের আশায় বসে আছে। হ্যাঁ, ও আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে কি ও আর পাবে!'

লাচি সবকিছু শোনে, কিন্তু চুপ থাকে। গুলের প্রতি তার পূর্ণ

আস্থা আছে। এক এক সময় তার হৃদয় হাহাকার করে উঠে, মনে হাজারো দুর্ভাবনা। তবুও সে মনের গভীর থেকে গুলের আশা ছাড়ে না। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সে মনকে প্রবোধ দেয়—গুল আসবে।

নিশ্চয়ই আসবে।

নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। হয়তো অসুখে পড়েছে। হয়তো চাকরী পায়নি। কিন্তু তাকে চিঠি তো লিখতে পারে! দু'লাইন লিখে জানাতে তো পারে! এভাবে নীরব থাকা ভালো নয়।

ঠিক দু'মাস দশদিন পর লাচির ঘরের সামনে পিওনের পায়ের আওয়াজ এসে থেমে গেলো। কিছুদিন থেকে লাচি ডাক-পিওনকে জিজ্ঞেস করাও ছেড়ে দিয়েছিলো। স্রেফ চুপচাপ আপন কামরায় পড়ে থেকে বিশাল শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

ডাকপিয়ন জোরে চেঁচিয়ে বললো, 'লাচি তোমার মানি-অর্ডার আছে।'

মুহূর্তের জন্যে যেন লাচির জ্ঞান লোপ পেলো। পর মুহূর্তে দরোজার কাছে ছুটে এলো এবং ডাকপিওনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলো। 'গুলের মানি-অর্ডার?'

'হ্যাঁ।'

'কোথা থেকে এসেছে?'

'পুনা থেকে।'

'কত টাকার মানি-অর্ডার?'

'ত্রিশ টাকার।'

'আর কি লিখেছে? মানি-অর্ডারের নীচে দেখো, নিশ্চয়ই আমাকে কিছু লিখেছে। কবে আসবে গুল? সে কি আমাকে ওখানে যেতে বলেছে? কিছু একটা তো লিখবেই। সোবহান, একটু ভালো করে দেখো।'

সোবহান পিওন মানি-অর্ডার ফর্মটা ভালো করে উল্টেপাল্টে দেখলো। 'না, কিছু লেখা নেই লাচি।'

লাচি চুপ করে গেলো। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকলো। পরে বললো, 'গুলের ঠিকানা তো লেখা আছে?'

'প্রেরক—ষ্টেশন মাষ্টার, পুনা।'

'তা কেন?'

'যাদের কোন ঘর থাকে না, অথবা যারা ঠিকানা জানাতে চায় না, তারা এভাবে টাকা পাঠায়।' সোবহান পিওন বললো।

লাচি বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকলো। তার মনটা এমনভাবে ছটফট করতে থাকলো যেন এক্ষুণি বেরিয়ে যাবে। তার হাত-পা কাঁপতে লাগলো। অনেক কষ্টে অশ্রু রোধ করে সে বড় আস্তে আস্তে বললো, 'সোবহান, এই মানি-অর্ডার আমার জন্যে নয়, একজন অন্ধ ভিখারিণীর জন্যে! তাই এই মানি-অর্ডার তুমি ফেরত পাঠিয়ে দাও।'

'লাচি, আমি জানি—তুমি গত তিন-চারদিন থেকে উপোষ। মানি-অর্ডারটা নিয়ে নাও লাচি।—এ টাকা দিয়ে অন্ততঃ একমাস তোমার আরামে কেটে যাবে।'

'না, সোবহান।' লাচি জোর দিয়ে বললো, 'ফেরত পাঠিয়ে দাও।'

বলেই লাচি জোরে ভেতর থেকে দরোজাটা বন্ধ করে দিলো।

দরোজার সাথে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাচি অনেকক্ষণ চিন্তা করতে থাকলো।

ডাকপিওনের পদশব্দ আস্তে আস্তে দূরে চলে যেতে লাগলো। যেন ডাকপিওন নয়, তার আশার শেষ ছায়া, তার গুলের শেষ ছায়া, ধরণীর বুক থেকে দূরে—অনেক দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে—আজীবনের জন্যে। শেষবারের মতো লাচি ঝুকে পড়ে নিজের প্রাণ-প্রিয় গুলের ছায়াটাকে সালাম করলো।

এবং যদিও কামরাটা অন্ধকার, তার চোখ জোড়াও অন্ধ, তবুও এই প্রথম তার কাছে সবকিছু বড় পরিষ্কার আর উজ্জ্বল দেখা যেতে লাগলো। পরিষ্কার আর উজ্জ্বল, যে রকম রাতের অন্ধকার—আদমের পাপ—সৃষ্টির সুবিশাল শূন্যতা……

লাচি ঝুকে পড়ে দেওয়ালের কোণ থেকে খুঁজে খুঁজে লাঠিটা বের করলো। তারপর বাইরে আধো-অন্ধকার দিয়ে রাস্তা খুঁজে খুঁজে ধীরে ধীরে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে চলে গেলো ভিক্ষে করতে!

—সমাপ্ত—